সঙ্গীতকলাবিদ্

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

এই লেখকের —

- ★ স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (গবেষণা-গ্রন্থ ২য় সংস্করণ)
- ★ ব্যঙ্গকবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে সমগ্র প্রাক্-স্বাধীনতাকালের ব্যঙ্গকবিতা ও গানের সংকলন; দীর্ঘ আলোচনা, প্রতিটি রচনার রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বিস্তৃত টীকাসহ)
- ★ হিমালয়ের পথে ভিলাঙ্গনা ও পাওয়ালী কান্থা (ভ্রমণ)
- ★ ডুগডুগি (ছড়ার বই)
- ★ তথ্য চিত্র চরিত্র (বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন)



সার্ রাজ-শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সঙ্গীতকলাবিদ্

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৯৪
।। সুবর্ণরেখা ।।
কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১৩৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০০

প্রকাশক : শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা ।। ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : এস্ এস্ এস্ লেজার,
৩৪, সি. আর. এভিনিউ,
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা ৭০০ ০১২

---------- উৎসর্গ ----------

স্বৰ্গীয় পিতৃদেব ও
স্বৰ্গীয়া মাতৃদেবীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

নিবেদন

বাংলার তথা ভারতের সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন এবং নতুন জীবনবোধসমৃদ্ধ সংস্কৃতিচেতনার বিকাশের ব্যাপারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের কয়েকজন জ্ঞানী-গুণীর অবদানও আমরা তুচ্ছ করতে পারি না। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুজ শৌরীন্দ্রমোহন সঙ্গীতকলাবিদ্ হিসাবে বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুমহান ঐতিহ্যকে এক দিকে তিনি যেমন সার্থকভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তেমনি অপর দিকে বিত্তবানদের বিলাসচর্চার সংকীর্ণ বেষ্টনী ভেঙে তিনি এই সঙ্গীতকে অনেকখানি মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম এই সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী সাধারণ মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল তাঁর সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও প্রেরণা। শৌরীন্দ্রমোহনের লেখা ছেচল্লিশখানি গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীতগ্রন্থের সংখ্যা ছাব্বিশ। আমি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মূল্য বিচার করার চেষ্টা করেছি। সে-চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে সে-বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকগণের ওপর।

শৌরীন্দ্রমোহন সম্পর্কে কিছু লেখার ব্যাপারে প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলুম প্রায় বত্রিশ বছর আগে আমার স্বর্গত পিতৃদেব ইতিহাস-প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তারপর এ-ব্যাপারে নিরন্তর উৎসাহ ও নানা মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন আমার পিতৃ-প্রতিম শিক্ষাগুরু স্বর্গত আচার্য সুকুমার সেন। তাঁদের উদ্দেশে আজ সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৮০ সালে। বইটি নিঃশেষিত হবার পর এতদিন আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাই নি। কোথায় বইটি পাওয়া যেতে পারে জানতে চেয়ে কেউ-কেউ চিঠি দিয়েছিলেন। দুঃখের সঙ্গে তাঁদের হতাশ করতে হয়েছে। শরীর ভালো যায় না। অসুস্থতা নাছোড়বান্দা। এ-অবস্থায় দ্বিতীয় সংস্কবণ যে কোনো দিন আর বার করতে পারব ভাবি নি। এমন সময় হঠাৎ একদিন এলেন 'সুবর্ণরেখা' প্রকাশন সংস্থার বন্ধুবর শ্রী ইন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি এসেছিলেন অন্য কাজে। আমার বইটি দেখে সাগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণ করার দায়িত্ব নিলেন। আজ তাঁকে আমার চিন্তাভারমুক্ত নন্দিত অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। আর অফুরন্ত স্নেহাশিস্ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রিডার আমার পরমাত্মীয় স্নেহাস্পদ্ ডক্টর বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়কে, যার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য পেয়েছি।

এই সংস্করণটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। আলোচনা অনেক জায়গায় বিশদ ও বিস্তৃত করা হয়েছে। কিছু নতুন তথ্যও সংযোজিত হয়েছে। সেকালের বিখ্যাত গায়িকা যাদুমণির প্রসঙ্গ এই সংস্করণে একটি মূল্যবান সংযোজন বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া পৃথকভাবে শৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্ট যুক্ত হয়েছে। ভুল-ত্রুটি যদি কিছু থাকে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পাঠক- পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চাই। বইটি সঙ্গীতপ্রেমীদের কোনো উপকারে লাগলে শ্রম সার্থক মনে করব।

১২৭/১, সন্তোষপুর এভিনিউ
কলকাতা - ৭০০ ০৭৫

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীতকলাবিদ্

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

১
পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর - পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এখানে ব্যবসা করতে এসে যখন দেশশাসন করতে শুরু করল তখন এ-দেশের ধনভাণ্ডারের ওপরেই নিবদ্ধ ছিল তার লুব্ধদৃষ্টি, জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে সে ফিরেও তাকায় নি। তাকালে হয়তো ঐহিক লাভের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে ভেবে এ-দেশে মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এক সময় শুধু ঘোরতর আপত্তিই জানায় নি, প্রবল বাধাও দিয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী যে-কোনো ইংরেজকে ভারতের মাটিতে পা দিতে হলে ছাড়পত্র নিতে হত। বিনা ছাড়পত্রে ভারতে এলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, ফিরতি জাহাজেই ঘরের ছেলেকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। উইলিয়াম কেরীকেও এ-দেশে আসার ছাড়পত্র দেওয়া হয় নি। অনেক ফন্দি করে ডেনমার্কের একটি জাহাজে চড়ে তিনি এখানে আসেন। আসার পর বেশ কিছু দিন তাঁকে চরম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। অবশ্য পরে কোম্পানীর মত বদলায়। তখন মিশনারীরা যেমন বিনা বাধায় ধর্মপ্রচার শুরু করেন তেমনি কয়েকজন য়ুরোপীয় যথার্থ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করেন এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। তাঁদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সমাজের সামনে প্রাচ্যবিদ্যার রত্নভাণ্ডারের দ্বার খুলে যায়। কিন্তু এক সময় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচ্যবিদ্যার গৌরবের কথা আমরা নিজেরাই ভুলতে বসেছিলুম। পাশ্চাত্য সভ্যতার জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে

উন্মত্ত হয়েছিলুম পরকীয়া প্রেমের রসোল্লাসে। 'পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর' — নীতিকে নির্বোধের মতো প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলুম ব্যবহারিক লেন-দেনের জগতে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আকর্ষণে কলকাতার ঠাকুর-পরিবারও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবকে তুচ্ছ করার মতো নির্বুদ্ধিতা তাঁদের ছিল না। বরং ওদেশের চিন্তা-ধারণা-জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরে গিয়ে সেগুলিকে এমন সার্থকভাবে যাচিয়ে নিতে বোধ হয় এদেশের আর কোনো পরিবারই পারেন নি। কিন্তু তাই বলে আপনকে পর করতে হয় নি। আপন-পরের আত্মিক মিলন সাধনের মধ্যেই ঠাকুর-পরিবারের মহান কর্মসিদ্ধি। এই সিদ্ধির রূপটি জোড়াসাঁকোর বংশধারায় অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠায় পাথুরিয়াঘাটার বংশধারার কথা আমাদের স্মৃতিতে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। তাই শৌরীন্দ্রমোহনের প্রসঙ্গে আসার আগে এই বংশধারার কয়েকজনের সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ঠাকুর পরিবারের মধ্যে পঞ্চানন কুশারীই প্রথম পঞ্চানন ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন। যশোর ছেড়ে গোবিন্দপুরে এসে তিনি বেশ কিছুকাল বসবাস করেন এবং কিছু বিষয়-সম্পত্তিরও মালিক হন। নতুন কেল্লা তৈরীর প্রয়োজনে কোম্পানী গোবিন্দপুরে অবস্থিত পঞ্চাননের বসতবাটী ও মন্দির দখল করে নেন। তার বদলে আদিগঙ্গার কাছে তাঁকে নতুন জমি দেওয়া হয়। তিনি সেখানে সপরিবারে উঠে যান। এই অঞ্চলে অনেক নিম্নবর্ণ মানুষের বাস ছিল। তারা পঞ্চাননকে ঠাকুরমশাই বলতে শুরু করে। সেই থেকে তাঁর 'কুশারী' পদবী ধীরে ধীরে আপনা হতেই হারিয়ে যায় এবং তার জায়গা নেয় 'ঠাকুর'। পঞ্চানন-পুত্র জয়রাম প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। জানা যায় বর্তমান ধর্মতলা অঞ্চলে ও কেল্লার কাছে জয়রামের কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল।[১] কেউ-কেউ মনে করেন জয়রামই প্রথম পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার কাছে খানিকটা জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করেন এবং তাঁর সময় থেকেই পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের বসবাস শুরু হয়। কিন্তু এ-তথ্য নির্ভুল নয়। অনেকে মনে করেন জয়রামের পুত্রদের সময়

থেকেই এই বসবাসের আরম্ভ। জয়রামের জন্ম-সাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। জয়রামের চার পুত্র— আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম।[২] এঁদের মধ্যে গোবিন্দরাম নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

নীলমণি ঠাকুর (? — ১৭৯১) পাথুরিয়াঘাটায় বসবাস শুরু করেন আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে সেরেস্তাদারের কাজ করতেন। তাবে এ-সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। না গেলেও এ-কথা ঠিক যে তিনি রোজগার কিছু কম করতেন না।

চার ভাইএর মধ্যে একমাত্র দর্পনারায়ণই (১৭৩১ -১৭৯৩) ছিলেন যথার্থ ধনী। সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে অন্যতম। ঐশ্বর্যের অনেকটাই তাঁর স্বোপার্জিত। নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, চন্দননগরে ফরাসী সরকারের অধীনে কাজও করেছেন। ইংরেজ এবং ফরাসী উভয় সরকারের সঙ্গেই তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধির ওপর অপরিসীম আস্থা নিয়ে কাজ করতেন বলেই বোধ হয় প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হতে পেরেছিলেন।

নীলমণির সঙ্গে দর্পনারায়ণের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে একটা বিরোধ দেখা দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় এসে দুই ভাই আলাদা হয়ে যান। দর্পনারায়ণ পাথুরিয়াঘাটাতেই থাকেন আর নীলমণি জোড়াসাঁকোয় নতুন বাড়ি তৈরি করে উঠে যান। এখানকার জমি তিনি পেয়েছিলেন জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে।

যা হোক এই সময় থেকেই ঠাকুর-পরিবারের দুটি ধারার জন্ম হয়। হতে পারে চোরবাগানের ঠাকুর-পরিবারও একই বংশোদ্ভূত।[৩] কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ধারা দুটিই জগদ্বিখ্যাত। দুটি ধারাই এক সঙ্গে এগিয়েছে। দুটি ধারার মধ্যেই পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে।[৪] অথচ মনে হয় একটি যেন অতীত, অপরটি বর্তমান; একটির কথা ভুলতে বসেছি, অপরটির কথা আমাদের স্মৃতিলোকে ঝলমল করছে। জোড়াসাঁকোর বংশধারার বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্তিতে পাথুরিয়াঘাটার

বংশধারার প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে। তা ছাড়া জোড়াসাঁকোর বংশধারায় যে বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ দেখা গেছে পাথুরিয়াঘাটার বংশধারায় তা ছিল না। এমন কি সে-মনোভাবের সমর্থনও বিশেষ প্রকাশ পায় নি। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল্যকে উপলব্ধি করলেও এবং তার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ থাকলেও এই ধারা ছিল কিছুটা রক্ষণশীল। হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগত বিধি-নিষেধের প্রতি এই ধারার আনুগত্য ছিল অটুট। তবু এই ধারার মধ্যে যে কজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের কথা মনে রাখা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। কারণ বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও যথেষ্ট। শৌরীন্দ্রমোহন তাঁদেরই একজন। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত পরিচয়-প্রসঙ্গে আসার আগে তাঁর পূর্বপুরুষদের কয়েকজন ও তাঁর অগ্রজ যতীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দুই পত্নী – প্রথমা তারিনী বা তারা সুন্দরী এবং দ্বিতীয়া বদনমণি। দুজনেই যশোরের মেয়ে। যশোরের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বৈবাহিক যোগসূত্র পুরুষানুক্রমিক। এবং এই যোগসূত্র উভয় ধারাতেই সমান প্রবল ছিল। যশোরের চাঙ্গুটিয়া দক্ষিণডিহি প্রভৃতি অঞ্চলের কন্যারা ঠাকুর-পরিবারে বধূ হযে আসতেন। এটা তাঁদের পারিবারিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক, দর্পনারায়ণের দুই পত্নীর গর্ভে সাত পুত্র ও দুই কন্যা জন্মেছিলেন। প্রথমার গর্ভে রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও পিয়ারীমোহন; এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে লাড়্লিমোহন, মোহিনীমোহন, রাইমণি ও নিমাইমণি। এঁদের মধ্যে স্বনামধন্য হলেন গোপীমোহন(১৭৬০ - ১৮১৯) – শৌরীন্দ্রমোহনের পিতামহ। তিনি ছিলেন সেকালের একজন সুশিক্ষিত রুচিবান মানুষ যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এবং স্বজাতির উন্নতিমূলক বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় এই ধারার মর্যাদা অনেক বর্ধিত হয়েছে। সেকালের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কিন্তু গোপীমোহন যদি শুধুই ধনকুবের হতেন তাহলে তাঁর কথা আমরা বিনা দ্বিধায় বিস্মৃতির গর্ভে ফেলে দিতে পারতুম। কিন্তু তাঁকে আমরা দেখেছি

অন্ধ-কুসংস্কারমুক্ত গুণী কর্মী হিসাবে, দেশ যাঁকে পেয়ে কম লাভবান হয় নি। সুগভীর পাণ্ডিত্য তাঁর না থাকলেও ছ'টি ভাষায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত, উর্দু, পারশী, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজী। তাঁর বাড়িতে প্রতি বছর দুর্গোৎসবে ভারতীয় ও অভারতীয় বহু ধনী ও গুণী সমাবেশ হত, এমন কি চিৎপুরের নবাবও আমন্ত্রিত হতেন। অবশ্য সেকালে বড়লোকদের দুর্গোৎসবে লাট-বড়লাট আর আমীর-ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে আনা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি এ-ব্যাপারে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও দেখা যেত। বাইজী-নাচ ও মদ-মাংসের খানা-পিনার ব্যবস্থাও হত। আভিজাত্য দেখাতে গিয়ে অঢেল টাকার অপব্যয় হত। কিন্তু গোপীমোহনের বাড়িতে আভিজাত্যের পরিচয় যেমনই থাক কদাচার বা অসংযত ক্রিয়াকলাপের পরিচয় থাকত না। সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যেত শিক্ষিত ও মার্জিত-রুচি একটি মানুষকে। মূলাজোড়ে বারোটি শিবমন্দির সমেত কালীমন্দিরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু গোপীমোহনকে আমরা বিশেষভাবে মনে রাখব দুটি কারণে — হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দান ও সক্রিয় সাহায্যের জন্যে এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রয়াসের জন্যে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। তাঁর নামে একটি বৃত্তিও দেওয়া হত। গোপীমোহন ছিলেন প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমী। সেকালের কলকাতার অনেক ধনী-পরিবারেই সঙ্গীতের প্রতি একটি মোহ বা বিলাস জন্মেছিল। কিন্তু ঠাকুর পরিবেরের সঙ্গীতচর্চা সঙ্গীতবিলাস ছিল না। কোনো মোহের আক্রমণে এ-বিষয়ে তাঁদের নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যায় নি। শুধু উৎসব উপলক্ষে নয়, গোপীমোহনের বাড়িতে সঙ্গীতের আসর বসতো প্রায়ই। সেকালের ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের অনেকেই তাঁর বাড়িতে আসতেন। গোপীমোহন তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনে আপ্যায়ন করতেন। সেকালের দুজন বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী — সজ্জু খাঁ ও লালা কেওয়াল কিষণ তাঁর কাছ থেকে মাসিক বৃত্তি পেতেন। শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নয়। কবি-সাহিত্যিকদেরও তিনি নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। কবি কালিদাস

মুখোপাধ্যায় ('কালী মির্জা' নামে পরিচিত) ও কবি লক্ষ্মীকান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

গোপীমোহনের ছয় পুত্র — সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, (ইনি গোপীমোহনের পরে হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক হয়েছিলেন) নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার, এবং প্রসন্নকুমার। এঁদের মধ্যে হরকুমার(১৭৯৮-১৮৫৮) ও প্রসন্নকুমারের (১৮০১-১৮৬৮) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুজনেই চিৎপুরের সের্‌বোর্ণ সাহেবের স্কুলে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও এখানেই পড়তেন। এখানকার পাঠ শেষ করে তাঁরা ভরতি হন হিন্দু কলেজে এবং প্রগতিশীল পাশ্চাত্য ভাব-চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। কিন্তু পরিণত জীবনে দুজনের প্রকৃতি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য গড়ে ওঠে। একজনের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে ভাব-কল্পনা আর একজনের মধ্যে অসাধারণ কর্মপ্রবণতা। হরকুমার ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতের জগতে আর প্রসন্নকুমারের অসাধারণ বিচক্ষণতা ফুটে উঠল আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এই দুটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান প্রসন্নকুমারকে কর্মজগতে দুর্লভ প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। গভর্নর জেনারেলের আইন-পরিষদের তিনিই প্রথম ভারতীয় সভ্য। মনে হয় তাঁর মতো পসার সেকালে আর কোনো আইনজীবীর ছিল না। যখনই তাঁর সহকর্মীরা আইন-সংক্রান্ত কোনো জটিলতার সম্মুখীন হতেন প্রসন্নকুমারের কাছে উপস্থিত হলেই তাঁদের সে-জটিলতা দূর হয়ে যেত। তাঁদের কাছে প্রসন্নকুমার ছিলেন যেন সচল গ্রন্থাগার। প্রকৃতই আইনশাস্ত্রে, বিশেষ করে হিন্দু-আইনে তিনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এ-বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি লিখেছিলেন। সেগুলির মধ্যে ইংরেজী 'Table of Succession according to the Hindu Law of Bengal' এবং বাংলা 'নিয়ম-পত্র' গ্রন্থ দুটি ও বাচস্পতি মিশ্রের 'বিবাদ-চিন্তামণি'-র অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া তাঁরই টাকায় পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Tagore Law Professor পদটি তৈরি হয়। হিন্দুত্বের সমর্থক হলেও প্রসন্নকুমার হিন্দুর



শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী।

গোঁড়ামীকে সমর্থন করতেন না। তাই গৌড়ীয়-সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি নিজের ভাবাদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। অবশ্য তার সঙ্গে ধর্ম বা রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেটি হল তাঁর 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। লেবেডেফের নাট্যাভিনয়ের পরে বাংলায় দীর্ঘকাল আর কোনো নাট্যাভিনয়ের খবর পাওয়া যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার আবার এই অভিনয়ের ধারা চাঙ্গা করে তুললেন। তবে 'হিন্দু থিয়েটার'-এ বেশির ভাগই ইংরেজী নাটকের অভিনয় হত। বাংলা অনুবাদ-নাটক দু-একটি অভিনীত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে মৌলিক বাংলা নাটকের তখন জন্মই হয় নি। মৌলিক বাংলা নাটক বলে পরিচিত জে. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, আর প্রথম সার্থক বাংলা নাটকের জন্মদাতা মধুসূদন দত্তের বয়েস ১৮৩১-এ মাত্র সাত বছর। এই অবস্থায় অভিনয়- শিল্পের উৎসাহকে জাগিয়ে রাখাই ছিল একটি বড় দায়িত্ব। প্রসন্নকুমার নিঃসন্দেহে সে-দায়িত্ব অনেকটা পালন করেছেন।

হিন্দু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারের একটা বংশগত দায়িত্ব ছিল। এই পরিবারের একজন ব্যক্তি কলেজের অন্যতম পরিচালক হিসাবে মনোনীত হতেন এবং গোপীমোহন ঠাকুরের সময় থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছিল। লর্ড ডাল্‌হৌসির আমলে যখন কলেজটির আভ্যন্তরীণ কিছু-কিছু পরিবর্তন ও নামান্তর সাধিত হয়, হিন্দু কলেজ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ, সে-সময় প্রসন্নকুমার সানন্দে সরকারের হাতে তাঁদের বংশগত দায়িত্বভার তুলে দেন। দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্যে প্রসন্নকুমার নানাভাবে চেষ্টা করেন। স্কুল-কলেজে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন রচনার ব্যাপারে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনারেল কমিটি অব্ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন'-এর পক্ষ থেকে এক প্রচেষ্টা দেখা দেয়। প্রসন্নকুমার তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্যের বিশুদ্ধ জ্ঞান-বুদ্ধিকে ভারতবাসী যদি তার স্বভাব ও স্বধর্মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তবেই তা সার্তক হবে। এই জন্যেই তিনি মনে করতেন, ইংরেজী

বিদ্যালয়গুলিতে মাতৃভাষাচর্চার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে তাঁর প্রচুর অর্থদানের কথা অনেকেই জানেন। কলকাতার পৌরসভা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি সভ্য ছিলেন। তা ছাড়া অন্যান্য জনহিতকর কাজেও তাঁর উদ্যম প্রশংসনীয় মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল।

সে-সময় বাংলায় সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এই বৈপ্লাবিক আন্দোলনের মধ্যে সেদিন তিনটি শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, চিরাগত সামাজিক অভ্যাস ও সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা; দুই, পাশ্চাত্যের চিন্তা-বুদ্ধির আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়ে অথচ প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা এবং তিন, সমাজের জীর্ণ কাঠামোর উপরে নতুন করে রং-মাটি না চড়িয়ে নতুন কাঠামোয় সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা। প্রাচীন-পন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় চিরাগত ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরে রাখতে চাইলেন। আর তাঁদের এই অন্ধ মোহকে দূর করে সমাজকে নতুন রূপ দিতে চাইলেন রামমোহন। এ-ব্যাপারে তাঁর অন্যান্য সহযোগিদের সঙ্গে প্রসন্নকুমারের নামও উল্লেখযোগ্য। বয়েসে যদিও প্রসন্নকুমার রামমোহনের চেয়ে উনত্রিশ বছরের ছোট[৪], কিন্তু রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের সময় তিনি যুবক। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার – প্রসন্নকুমার ও হরকুমার ছাড়া পাথুরিয়াঘাটাব ঠাকুর-পরিবারের মধ্যে আর কেউ সে-দিন রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে আবার প্রসন্নকুমারের উপর রামমোহনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। এ-সম্পর্কে ফারেল সাহেব মন্তব্য করেছেন — "At an early age Prasanna Coomar came under the influence of Ram Mohan Roy; and as in the case of Dwaraka Nath Tagore, the consequence was a redical change in the religions views in which he had been brought up".[৫] বংশগত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের

গণ্ডিকে অনায়াসে অতিক্রম করে নব ধর্ম-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো প্রসন্নকুমারের নূতনত্ব-বিলাসী মনোভাবের পরিচয় নয়। একেশ্বরবাদে যথার্থ বিশ্বাস নিয়েই তিনি এগিয়ে ছিলেন, এবং ব্রহ্মবাদীদের মতো 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর তত্ত্ব দেশবাসীকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন। 'An appeal to his countrymen by Prasanna Coomar Tagore' নামক পুস্তিকাই তার প্রমাণ।

সংস্কারপন্থীদের মধ্যেও দু-ধরনের মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেও একদল সংস্কারপন্থী হিন্দুত্বের গোঁড়ামিকে বা হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত বিধিনিষেধগুলিকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারলেন না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের দেব-পরিবার প্রভৃতি কয়েকটি পরিবার এই দলভুক্ত; আর একদল সংস্কার-পন্থী হিন্দুত্বকেই সংস্কার করতে চাইলেন — অর্থহীন গোঁড়ামি এবং নির্মম বিধিনিষেধগুলির হাত থেকে হিন্দুদের মুক্তি দিতে চাইলেন। রামমোহন রায়ের অনুগামীরা — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি এই দলভুক্ত। আসলে এই দলটি সেকালের 'তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী'। প্রসন্নকুমার প্রথম দলের সংস্কার-পন্থী হলেও তাঁর মনোভাবের সংযোগ ছিল দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। এবং এ-ব্যাপারটি তাঁর ওপর রামমোহনের সাক্ষাৎ প্রভাবের ফল।

যা হোক, সংস্কার-পন্থীদের কাজের শুরু থেকেই দেশে একদল নবীন-পন্থীর আবির্ভাব ঘটে। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষা ও ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কলেজেরই একদল প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র সেদিন সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা ছিলেন ভেঙে গড়ার পক্ষপাতী। তাই তাঁদের শাণিত যুক্তচিন্তার আঘাতে প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার মূল পর্যন্ত সেদিন নড়ে গিয়েছিল। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে আজ আমরা এই আঘাতের মূল্যবিচার করতে পারি বটে, কিন্তু সেদিন এর ফলে সংস্কার-পন্থীরাও বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ডিরোজিয়ান্‌দের মনোভাব ও নির্ভীক কাজকর্মে অনেকেই তখন "গেল, গেল— সব গেল!" — বলে চিৎকার শুরু করেছিলেন। ১৮৩১

খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রমানাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় প্রসন্নকুমার 'রিফর্মার' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর উৎসাহে একটি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল — নাম 'অনুবাদক'। কিন্তু এই বছরেই মে মাসে নবীন-পন্থীদের অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এনকোয়ারার্' পত্রিকা প্রকাশ করে 'রিফর্মার্'-এর সঙ্গে রীতিমতো লড়াই শুরু করে দেন।[৬] কিন্তু 'রিফর্মার্' তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা। এতে শুধু সামাজিক সমালোচনাই থাকত না, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনাও স্থান পেত। সে-যুগের রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসন্নকুমার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রকৃতিই — "Like Dwaraka Nath Tagore he was essentially a man of action."[৭] কিন্তু গোড়া থেকেই যিনি মিশনারীদের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন তাঁরই একমাত্র পুত্র – ভারতের প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টান হয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে বিয়ে করেন। এর আঘাত প্রসন্নকুমারের অন্তরে আমৃত্যু স্থায়ী হয়েছিল।

কিন্তু হরকুমার ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বাইরের কর্মজগতের সঙ্গে তিনি কোনো দিন ঘনিষ্ঠ হন নি। সে-ইচ্ছাও বোধ হয় তাঁর ছিল না। সাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চা নিয়েই তিনি থাকতেন। আর পিতা গোপীমোহনের মতো তাঁর শুধু মনেই সুর ছিল না, কণ্ঠেও ছিল। সে-কালের প্রখ্যাত সঙ্গীত-কলাবিদ্ গোয়ালিয়র ঘরাণার গায়ক হস্সু খাঁর (মৃত্যু - ১৮৭৫) কাছে নিয়মিত তালিম নিয়ে তিনি রীতিমত গায়ক হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সেতারেও তাঁর ভালো হাত ছিল। পিতার সঙ্গীত-প্রীতি পুত্রের মধ্যে সঙ্গীত-সাধনায় পূর্ণতা লাভ করে।

সে-কালের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসাবেও হরকুমারের বিশেষ সুনাম ছিল। ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত ও পারশী ভাষাতেও তার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। এ দুটি ভাষাতেই তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবেই খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সংকলিত 'হরতত্ত্বদীধিতি' (১৮৮১) এবং

'পুনশ্চরণ-বোধিনী' (১৮৯৫) গ্রন্থ দুটিকে সে-কালের পণ্ডিত-সমাজ যথেষ্ট মূল্য দিতেন। দুটি সংকলন-গ্রন্থই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রাজা রাধাকান্ত দেবও শাস্ত্রাদির ব্যাপারে হরকুমারের সাহায্য নিতেন।

সে-সময় বেদান্তদর্শনচর্চাকে অনেক গোঁড়া হিন্দু বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা মনে করতেন এই চর্চারি ফলেই একদল লোক হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়ে নতুন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন শুরু করেছেন। অথচ হরকুমারের বেদান্তদর্শন চর্চাতেই আগ্রহ ছিল বেশি। এ-ব্যাপারে আত্মীয়দের কাছ থেকে গঞ্জনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। হরকুমারের খুড়তুতো ভাই উমানন্দন ঠাকুরের বাড়িতে একদিন তিনি বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। উমানন্দন তাঁর বেদান্তচর্চারি খবর আগেই পেয়েছিলেন। তিনি হরকুমারকে বলেন – "দেখ হে, তোমার বেদান্তচর্চারি খবর পেয়ে আমি কিন্তু খুবই দুঃখ পেয়েছি"। হরকুমার জানতে চান বেদান্তচর্চা দুঃখের কারণ হয় কী করে। উমানন্দন বলেন, "আমরা তোমাকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলেই জানি; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই নতুন জ্ঞানচর্চা তোমাকে নির্ঘাত বিধর্মী করবে।" ('বিধর্মী' বলতে ব্রাহ্ম হওয়ার কথাই উমানন্দন বোঝাতে চেয়েছিলেন)। হরকুমার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন, — "কিন্তু ভুলে যেও না ভাই, ব্যাসদেব – যিনি বেদান্তদর্শনের জনক, তিনিই পুরাণ রচনা করেছিলেন। তাহলে তোমার মত অনুযায়ী তিনি তাঁর সময়ের সব চেয়ে বড় বিধর্মী।"[৮]

যা হোক , এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে প্রসন্নকুমারের মতো ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সমর্থন হরকুমারের কাজকর্মে প্রকাশ না পেলেও এই ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল।

হরকুমারের দুই পুত্র – মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন (১৮৩১-১৯০৮) এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন (১৮৪০-১৯১৪) । ইংরেজদের তোষামোদ করে সে-যুগে অনেকেই 'রাজা-মহারাজা' হয়েছিলেন। এ-সব উপাধি ছিল নির্জলা ইংরেজ-ভক্তির উপহার। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারে অবশ্যই ইংরেজ-ভক্তির অভাব ছিল না। কিন্তু স্বদেশ বা স্বজাতির কথা ভুলে গিয়ে

শুধু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আত্মবিস্মৃত অন্ধ ইংরেজ-ভক্তির পরিচয় ঠাকুর-পরিবারে কখনোই দেখা যায় নি। তাই মনে রাখা দরকার সে-যুগের তথাকথিত রাজা-মহারাজা এঁরা ছিলেন না। আর ছিলেন না বলেই দেখা যায় বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারায় দু-জনের অবদান যথেষ্ট। আজ দেশের চারিদিকে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতচর্চার প্রশংসনীয় আয়োজন দেখা যাচ্ছে। অথচ আজ থেকে প্রায় একশ' দশ-পনেরো বছর আগে এ-দেশের শিক্ষিত-সাধারণের মন থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞাকে দূর করবার জন্যে, সমস্ত বিশ্বের সামনে আমাদের এই সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যিনি প্রথম ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ও সনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়েছিলেন সেই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথা আজ আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মানের দিক থেকে যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন তাঁদের পিতৃ-পিতামহকে অনেক ছাড়িয়ে গেছেন। পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবকে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের নব-জাগরণকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে। তাই দেখা যায় ইংরেজী শিক্ষা, রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা রাজকীয় সম্মান তাঁদের স্বাজাত্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। হরকুমারের এই দুই পুত্রের সম্বন্ধে লোকনাথ ঘোষের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। –

"The most creditable trait in the character of both is that neither their high mental culture nor their free unrestrained intercourse in the highest circle of European society has shakened or even weakened their orthodoxy in their national faith nor tempted them to swerve from a strict adherence to national habits and customs."[৯]

হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে তাঁরা দুজনেই ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে সুন্দর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ড্‌সন ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের গৃহশিক্ষক। কিন্তু ইংরেজী-চর্চার সঙ্গে

সংস্কৃত-চর্চাও চলেছিল সমানতালে। আর সেই সঙ্গে ছিল বাংলা সাহিত্যানুশীলনের নতুন প্রেরণা ও উদ্যম। সে-সময়টা বাংলা নাটকের আদিযুগ। ইংরেজী আদর্শ সামনে রেখে বাংলা নাটক লেখা ও তার অভিনয়ের ব্যাপারে কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত পরিবারে যে-সময় যে প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তার আলোচনা এখানে অবান্তর হলেও একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের দুটি ধারার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলার নাট্য-আন্দোলন সে-দিন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত আচার্য সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, – "পাইকপাড়ার রাজাদের পর বাংলা নাট্যাভিনয়ে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন ঠাকুর-পরিবারের দুই তরফ – পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার অনুজ সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাঁকোর গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদনুজ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইঁহাদের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"।[১০]

সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে যতীন্দ্রমোহন অনুজের মতো পৃথিবীবিখ্যাত ছিলেন না বটে তবু সঙ্গীতে তার জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। শুধু হিন্দু-সঙ্গীতে নয়, পাশ্চাত্য-সঙ্গীতেও। বাংলা গানের সঙ্গে অর্গান অথবা হারমনিয়ামের ব্যবহার তিনিই প্রথম শুরু করেন। ঐকতানবাদ্যের সাহায্যে অভিনয়ের সময় আবহসঙ্গীতের যে নতুন পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন অল্পকালের মধ্যেই তার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়।

সে-যুগের রাজনীতি এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের সঙ্গেও যতীন্দ্রমোহন সক্রিয় যোগ রক্ষা করে চলতেন। হিন্দুমেলা, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা কমিশন ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের তিনি সভ্য ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদেও তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। **Settled Estates Act** প্রচলনের ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তিনি একজন অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন। কিন্তু আমরা

জানি না তাঁর এমন কোনো কাজের কথা যার মধ্যে তাঁর রাজভক্তির অসঙ্গত আতিশয্য ফুটে উঠেছে। এবং জানি না বলেই 'ভার্নাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট্'-এর প্রতি তাঁর সমর্থন আমাদের বিস্মিত করে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় মৃত্যুর তাণ্ডব। দারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বহু লোক মারা যায়। অথচ দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ সরকার যুদ্ধপরিচালনার জন্যে ব্যয় করেন। এ-ব্যাপারে তখনকার দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ইংরেজ সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের সেই কঠোর সমালোচনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে লর্ড্ লিটন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ এক রকম রাতারাতিই 'ভার্নাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট্' নামক নাগপাশ তৈরি করে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তখন অনেকেই সরব হয়ে ওঠেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় কোনো রকম সরকারী হস্তক্ষেপ যতীন্দ্রমোহন সমর্থন করতেন না। তবু এই আইন প্রবর্ত্তনের সপক্ষে মত দিয়ে তিনি কেন যে সেদিন দেশবাসীর গঞ্জনা কুড়িয়েছিলেন বলা কঠিন। অবশ্য তাঁর মতের মধ্যেও বিলের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল বলে মনে হয় না। ইংল্যান্ডের তদানীন্তন প্রাধানমন্ত্রী গ্লাড্স্টোন্ এ-সম্পর্কে তখন পার্লামেন্টে মন্তব্য করেছিলেন- "... This is the opinion of the only native member of the Council, given in support of the Bill but not of the matter of the Bill"[১১]

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন উঁচুদরের প্রতিষ্ঠা পান নি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তাঁর আন্তরিক অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। গানও কিছু লিখেছেন। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কয়েকটি গান তাঁরই লেখা।[১২] 'গীতিমালা' নামে স্তব ও সঙ্গীতের একটি সংকলনও তিনি প্রকাশ করেন। তাছাড়া লিখেছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর নাটক'। অন্য কোনো নাটক তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে তাঁর এই একটি নাটকই তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহনের চেয়ে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহনই বেশি প্রশংসার দাবি করতে পারেন। মধুসূদনের

সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতি-বন্ধনের কথা আমরা জানি। সে-বন্ধুতা শুধু পারস্পরিক কুশল আদান-প্রদানের মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে থাকে নি – যুগস্রষ্টা কবির কাছে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মুদ্রণের ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহনই বহন করেছিলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনার সময় কবির সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের ছন্দবিষয়ক মতভেদের কথা সকলেরই জানা আছে। কাব্যটি রচনার সময় প্রতিটি সর্গ তিনি মতামতের জন্যে যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাতেন। এই কাব্যটি যতীন্দ্রমোহনকে উৎসর্গ করে এবং তার পাণ্ডুলিপিটি তাকে উপহার দিয়ে কবি তাঁর সঙ্গে প্রীতিবন্ধনের পরম পরিচয় রেখে গেছেন।

যা হোক, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশ সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একটা কথা বোধ হয় পরিষ্কার হল যে শৌরীন্দ্রমোহন যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার শুধু ঐশ্বর্যই ছিল না, একটা মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ছিল। সেই ঐতিহ্যের ধারক শৌরীন্দ্রমোহনের কাছ থেকে, বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, বাঙালি তথা ভারতবাসী কম লাভবান হয় নি। প্রকৃত পক্ষে এ-দেশের সঙ্গীতকে শুধু এ-দেশবাসীর কাছে নয়, বিশ্বের দরবারে সসম্মান গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার উজ্জ্বল ও মহান কৃতিত্ব একমাত্র শৌরীন্দ্রমোহনের। পরের অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

তথ্যসূত্র

১। গোবিন্দপুর ও বর্তমান ধর্মতলা অঞ্চলে জয়রামের যে বাড়ি ও বাগান-বাড়ি ছিল সে-কথা স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিখ্যাত '*বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*' নামক গ্রন্থের ব্রাহ্মণকাণ্ডের পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি রাধাবল্লভ ঠাকুরের একটি মোকদ্দমার নালিসী আরজী থেকে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন–

"Joyram's house was at Dhannosayer now called Dhurrmtollah and had a garden-house where Fort William is now built and a Baitakkhana near his house and lands at Dhurrmtollah."

দর্পনারায়ণ ও নীলমণির মধ্যে কে বড় ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। ফারেল

সাহেব তাঁর *'The Tagore Family —a Memoir'* নামক গ্রন্থে দর্পনারায়ণকেই বড় বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর *'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'* গ্রন্থে (ব্রাহ্মণকান্ড ৩য় ভাগ) এই মত ভুল বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে নীলমণি ঠাকুরই বড় ছিলেন। এই লেখায় নগেন্দ্রনাথের মতই গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। দ্রষ্টব্য - *'বংশ-পরিচয়'*, ৪র্থ খণ্ড, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্তৃক সংকলিত, পৃ-৩।

৪। রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ খ্রষ্টাব্দে(অন্য মতে ১৭৭৪ খ্রী-) এবং প্রসন্নকুমারের জন্ম হয় ১৮০১-এ।

৫। J.W.Furrell - *'The Tagore Family —a Memoir'*, P.98.

৬। দ্রষ্টব্য - শিবনাথ শাস্ত্রী — *'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*, পৃ-১১৭।

৭। *'The Tagore Family'* P.83

৮। Loke Nath Ghose — *'The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc.'* Part II, PP-169-70

৯। ঐ, পৃ-১৭১

১০। সুকুমার সেন, *'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'* ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং- পৃ-৯৮।

১১। দ্রষ্টব্য —*Hansard's Parliamentary Debate,* Vol, 242, Part-1 P.57

১২। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন — ''কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত।'' কিন্তু 'মধুস্মৃতি'-র লেখক নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে যতীন্দ্রমোহন এই নাটকের মাত্র দুটি গান রচনা করে দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথের মতই সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্য — *সাহিত্য-সাধক চরিত- মালা,* ২য় খণ্ড।

২

সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ও প্রখ্যাত গায়িকা যাদুমণি

অগ্রজ যতীন্দ্রমোহনের মতো শৌরীন্দ্রমোহনের জ্ঞান ও পারদর্শিতার পরিচয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে নি। বহির্জগতের নানা কাজে নিজেকে ছড়িয়ে না দিয়ে গভীর নিষ্ঠা, অটুট ধৈর্য আর নিরলস অনুশীলনের সাহায্যে তিনি হিন্দু-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যময় স্বরূপকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীত সম্বন্ধে নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন শিক্ষিত-সাধারণের অন্তরে। শুধু তাই নয়, আরো মহৎ কৃতিত্বের দাবি রাখেন শৌরীন্দ্রমোহন। তিনিই এ-কালের প্রথম ভরতবাসী যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিচয়কে সার্থকভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন, আর নিজে লাভ করেন বিমুগ্ধ বিশ্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা। এ-ব্যাপারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো তাঁর ওপর যে-সব উপাধি ও সম্মান বর্ষিত হয়েছিল তার সুদীর্ঘ তালিকার দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। সেকালের সঙ্গীত-জগতে আর কোনো ভারতীয়ের নাম করা যায় না যিনি এমন অসাধারণ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। অথচ কখনো বিদেশে যান নি।

১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪০ খ্রী) ৬৫ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে শৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম। খুব অল্প বয়েসেই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নকালেই কিশোর শৌরীন্দ্রমোহন প্রথম বই লেখেন — 'ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত'। তাঁর বয়েস তখন চোদ্দ বছর। তিন বছর পরে

১২৬৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। পববর্তী জীবনে যিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ্ হিসাবে বিশ্ববন্দিত হবেন কৈশোরে ইতিহাস-ভূগোলের প্রতি তাঁর এমনতর আসক্তি একটু বিস্ময়কর। কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে যখন দেখব পরিণত বয়েসেও তিনি এমন অনেকগুলি তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে যেগুলির বিষয়বস্তুগত লেশমাত্র যোগ নেই, এবং একজন নিবিষ্টমনা সঙ্গীতকলাবিদের কাছ থেকে যে-সব বিষয়ের আলোচনা আমরা আশাই করতে পারি না। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিশেষ মূল্যবান সঙ্গীতগ্রন্থ রচনার সাথে সাথে যদি কোনো সঙ্গীতপ্রেমী লেখক, বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সামাজিক ইতিহাস, রসায়নতত্ত্ব, হিন্দু সমাজের বর্ণ-বৈষম্য, ভারতীয় অশ্বকুলের বংশপরিচয় ইত্যাদি বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে অবশ্যই বিস্মিত হবার কারণ ঘটে। তবে এই বইগুলির প্রকৃত লেখক শৌরীন্দ্রমোহন কিনা সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাঁর গ্রন্থাবলী প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করে এসেছে। এখানে সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-এক কথা বলছি। সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে বাংলাদেশে এই সঙ্গীতের উৎকর্ষের উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। এই বিখ্যাত কাব্যটি মূলত সঙ্গীত। এতে কাব্যধর্মের চেয়ে অনেক বেশি আছে গীতিধর্ম। সমগ্র কাব্যটিই গাওয়া হত, এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে রাগ-রাগিণী ও তালের নির্দেশ দেওয়া আছে। সঙ্গীত যে আমাদের শুধু শ্রুতিসুখ সাধন করে তাই নয়, সঙ্গীতের সাহায্যে প্রাচীনকালে য়ুরোপে মানসিক রোগের চিকিৎসা করা হত। বিভিন্ন বৃত্তির বিশৃংখলা এবং চেতনার উন্মার্গিকতাকে সংযত করে মনের সুস্থতাকে ফিরিয়ে আনা হত সঙ্গীতের সাহায্যে। বাংলা কাব্য থেকেও এই ধরনের চিকিৎসার কথা জানা যায়। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের কাহিনীতে আছে নাথপন্থী সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের সঙ্গীত জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর নামে একটি কল্যাণ রাগও প্রচলিত আছে — গোরক্ষকল্যাণ। তিনি তাঁর নীতিভ্রষ্ট

অধঃপতিত গুরুকে নাকি উদ্ধার করেছিলেন মাদল বা মৃদঙ্গ বাজিয়ে। তাঁর বাজনা শুনে গুরুর মানসিক পরিবর্তন হয়েছিল। সঙ্গীতের প্রভাবে যে মানসিক ভাব-অনুভূতির পরিবর্তন ঘটে, আমাদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রীও যে এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না — এ কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বৈজ্ঞানিক সত্য । সে-আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলা সাহিত্যের প্রচীনতম নিদর্শন চর্যাপিদাবলীও সঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। কোন্ পদ কোন্ রাগে গাওয়া হত সে -সম্বন্ধে পদগুলির উপরেই নির্দেশ আছে। পাটমঞ্জরী, গুঞ্জরী (গুজরী?), মালসী, গৌড়, ভৈরবী, কামোদ প্রভৃতি বিভিন্ন রাগের সঙ্গে পদগুলির সম্বন্ধ রয়েছে। এ-সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন — "চর্যাপদ গীতিগুলির রাগরূপকে বর্তমানের অনুযায়ী নির্ধারিণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়...।"[১]

চর্যাপিদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় — " The names of these Ragas are very interesting, as they introduce to us many new names not previously known... the most surprising name in the list is the melody named 'Sui' and 'Dhimpanasi', which has not so far, been cited in any of the texts"[২].

অবশ্য রাগ-রাগিণীর সমাজে এই ধরনের নামগুলি কৌলীন্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তাছাড়া রাগসঙ্গীত হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য কতটা এ-প্রশ্ন নিয়েও তর্ক হয়েছে। এখানে সে-আলোচনার অবকাশ নেই। তবে একটা কথা আমরা বিনা তর্কে মেনে নিতে পারি যে শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নয়, সমগ্র পদাবলী সাহিত্যই সঙ্গীত হিসাবে রাগ-রাগিণীর সুস্পষ্ট ও সার্থক প্রভাব বহন করছে। পনেরো-ষোলো শতকের কথা — "বাংলার নানুরে ও বীরভূমে তখন পল্লীগানের নাম নিয়ে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীদের সমাবেশে পদগান বা পদকীর্তনের ধারা প্রবাহিত ছিল"[৩]। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্র হিসাবে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। কয়েকজন স্বনামধন্য

সঙ্গীতাচার্যের সাধনায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও গড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্র ছিল বিষ্ণুপুর এবং ইনিই ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতগুরু। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের সময় (১৮৫৮ খ্রী) ক্ষেত্রমোহনই এ-দেশে প্রথম ঐকতান বাদনরীতির প্রবর্তন ও ঐকতানিক স্বরলিপি রচনা করেন। এমন একজন গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলেই শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতজ্ঞান সার্থকতা ও পূর্ণতার পথ খুঁজে পায়।

কিন্তু একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ্ হয়ে ওঠার আত্মতৃপ্তিতেই শৌরীন্দ্রমোহনের বাসনার অপমৃত্যু হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরূপকে নতুন করে উদ্‌ঘাটন করতে। তাই শুরু থেকেই সাধকের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুশীলন আরম্ভ করেন। এই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা কি রকম ছিল তা হয়তো এ-যুগের অনেকে কল্পনাই করতে পারবেন না।

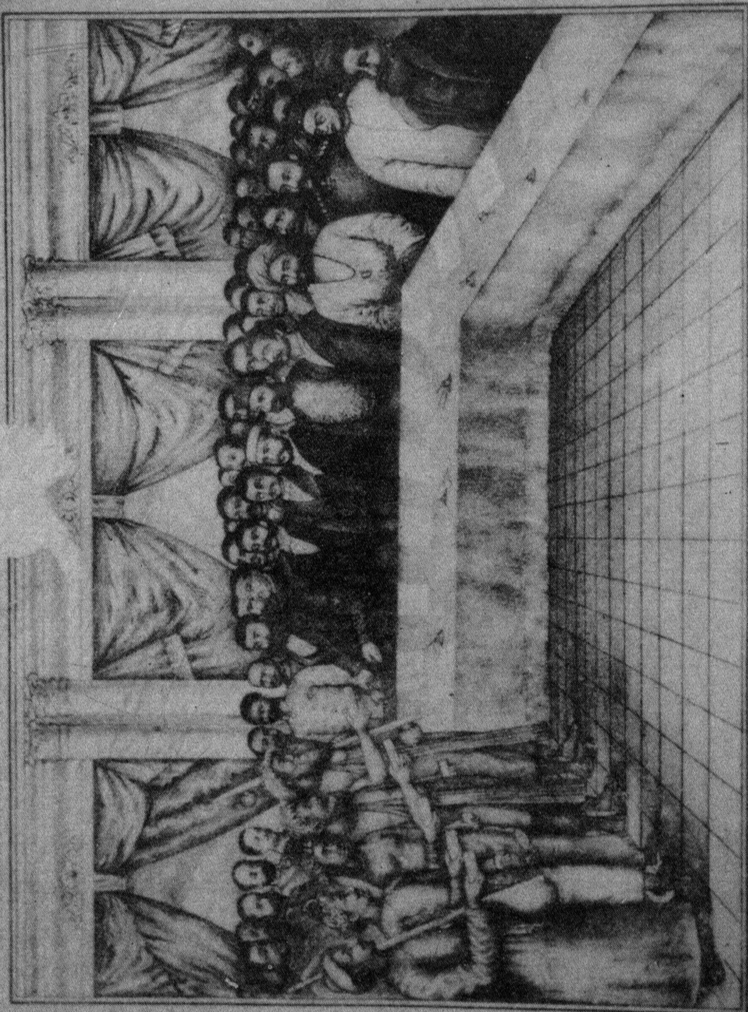
গান শিখতে গিয়ে শৌরীন্দ্রমোহন প্রথমেই ধরলেন সংস্কৃত কলাপ ব্যাকরণ। পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের কাছে দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই ব্যাকরণের দুরূহ পাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ কোথায় ? যোগ তত্ত্ব এবং ইতিহাসের দিক থেকে। সংস্কৃতে লেখা বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ধারে নিজেকে সক্ষম করে তোলাই ছিল এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা ও সঙ্গীত সমন্ধে গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এ ব্যাপারেও অগভীর মামুলী জ্ঞানের সহজ পথে না গিয়ে প্রকৃত সাধনার পথেই তিনি পা বাড়ালেন। একজন বিখ্যাত জার্মানি সঙ্গীতজ্ঞের কাছে পিয়ানোয় তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চা শুরু করলেন এবং বেশ কিছু কাল সাধনার পর পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন উঁচুদরের গায়ক ছিলেন না; কিন্তু সঙ্গীতের তত্ত্বীয় জ্ঞানের দিক থেকে তিনি তাঁর গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। একথার

সত্যতা তাঁর রচিত সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থগুলি আলোচনার মধ্যে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। পরবর্তী অধ্যায়ে সে-আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু তাঁর সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর একটি স্বীকারোক্তি তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীতসারঃ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করছি। যতীন্দ্রমোহনের অনুরোধে ক্ষেত্রমোহন সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। কিন্তু পরে — ক্ষেত্রমোহন লিখেছেন — "উক্ত শ্রীযুক্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (আমি যাঁহাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র বলিয়া অভিমান করি) সেই আয়ুষ্মান্ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় মৎপ্রণীত সেই পুস্তক দৃষ্টে আদরাতিশয়ে উৎসাহ প্রদান-পূর্ব্বক আমাকে সাধারণের নিকট প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন, হইয়া অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রমপ্রাচুর্য স্বীকার করতঃ নানা সংস্কৃত, ইংরাজী ও পারশ্য প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া তত্তৎ গ্রন্থের সারাংশ ও প্রমাণ প্রয়োগাদি সমুদয় সংগ্রহপূর্ব্বক আমার ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রভূতরূপে পল্লবিত করিয়াছেন।"[৪] 'সঙ্গীতসারঃ' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখন শৌরীন্দ্রমোহনের বয়েস আটাশ বছর। সঙ্গীতকলায় এই অসাধারণ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই যদিও তাঁর পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা তবু মনে হয় এ-ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি আরো মহৎ, আরো মূল্যবান। পরবর্তী আলোচনায় এ-কথার যথার্থ্যের প্রমাণ মিলবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ মানসতা নিয়ে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি-সমাজ নতুন করে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। একদিকে যেমন ছিল বিচারপ্রচেষ্টা অন্যদিকে তেমন ছিল নবরূপায়নের আকাঙ্ক্ষা। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিতসমাজে এই আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন। মুনি-ঋষিদের নাম নিয়ে শুধু আত্মতুষ্টির মনোভাবকে দূর করে নতুন চিন্তাবুদ্ধির আলোকে এগিয়ে চলার চেষ্টা শুরু হল। প্রথম দিকে বিজাতীয়তার প্রতি মোহের জন্যে এই অগ্রগতি হয়তো কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মোহমুক্ত স্বচ্ছ বিচারণার সাহায্যে পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সার্থক প্রচেষ্টার পরিচয় ফুটে ওঠে। আমাদের অতীত ইতিহাস গৌরবময় এ-কথা জোর গলায় ঘোষণা করলে, অথবা এই আত্মতৃপ্তির আফিঙের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে আমাদের

ভবিষ্যৎ ইতিহাস উজ্জ্বল হবে না। সে - ইতিহাস গড়তে হলে চাই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ভাবসম্মিলন, আর বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নত ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকরণ করে নেওয়ার উদারতা ও দক্ষতা। এই উদারতা, দক্ষতা ও সক্রিয়তার এমনতর বলিষ্ঠ সার্থক পরিচয় বোধ হয় ভারতের আর কোনো পরিবারে পাওয়া যায় নি যেমনটি পাওয়া গিয়েছিল কলকাতার ঠাকুর-পরিবারের দুটি ধারার মধ্যে। এই কারণেই শৌরীন্দ্রমোহন শুধু ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্যে তন্ময় হয়ে থাকেন নি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরূপের সঙ্গেও পরিচিত হন ঘনিষ্ঠভাবে। এই পরিচয় ছিল বলেই ভারতীয় সঙ্গীতের সমুন্নত বৈভবকে সভ্য দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন, আর ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এ-দেশের সঙ্গীতকলার উৎকর্ষসাধনে। বারাণসী, কাশ্মীর, নেপাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দূর-দূরান্তের বহু স্থান থেকে বহু মূল্যবান সঙ্গীতগ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, এবং এর জন্যে যে-কোনো মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত থাকতেন। শুধু সঙ্গীতগ্রন্থ নয়, বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের বহু বাদ্যযন্ত্রও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই সব বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের বাদনরীতি সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সে-সময় বিদেশ থেকে বহু লোক তাঁর এই বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ দেখতে আসতেন। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে তাঁর নামে বাদ্যযন্ত্রের একটি মূল্যবান সংগ্রহ রক্ষিত আছে। প্রায় আটাশ বছর আগের কথা। তখন এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের জন্যে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে আমাকে যাতায়াত করতে হত। তখন একদিন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে শৌরীন্দ্রমোহনের বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহটি দেখতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল সেখানকার নৃতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন কিউরেটর ডক্টর এন. সি. চৌধুরীর সঙ্গে। ডক্টর চৌধুরী তখন আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ১৯৬১-র কোনো এক সময়ে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটি মিউজিয়ামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাদ্যযন্ত্রের একটি চমৎকার প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে এশিয়ার বাদ্যযন্ত্র বিভাগে ভারতের সে-সব বাদ্যযন্ত্র প্রদর্শিত হয় সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই নাকি শৌরীন্দ্রমোহনের দান। খবরটি শুনে আমি স্বভাবতই খুব আশ্চর্য হই।



'ভারতীয় পঞ্চমুখ্য সঙ্গীতকারোপহার' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি ছবি।
ভরত, রম্ভা, হুহু, নারদ এবং তম্বুরু বার্লিনে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের সভায় উপস্থিত হয়েছেন।

শৌরীন্দ্রমোহন কাকে তাঁর এই বাদ্যযন্ত্রসম্ভার দান করেছিলেন? কেন করেছিলেন? এ-সব প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়ে তোলে। এ-ব্যাপারে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমি কলকাতার ইউ.এস্.আই.এস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় নিউইয়র্কের 'মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব্ আর্ট'-এর বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহবিভাগের কিউরেটরের কাছ থেকে আমি সে-সময় যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম প্রসঙ্গত এখানে তা উদ্ধার করছি। —

"We had a large exhibition of about a thousand musical instruments June 21 - September 11, 1961, and November 17, 1961 - January 1962 at the museum. This exhibit contained a large number of beautiful instruments from India. I also know from our catalogue of INSTRUMENTS OF ASIA that Raja Sourindra Mohan Tagore made the gift during the last century of a collection of Indian instruments to Mrs. Crosby Brown, who later donated her whole collection to the Metropolitan Museum of Art. Our files and catalogues do not refer to the earlier history of each single instrument and I do not know whether the records revealing the data concerning the donations made by Mrs. Crosby Brown still exist. At any rate it would not be easy to do this research."[৫]

ক্রশ্বি ব্রাউন নামক মহিলা কে ছিলেন, তাঁকে কত বাদ্যযন্ত্র শৌরীন্দ্রমোহন উপহার দিয়েছিলেন এবং কেন দিয়েছিলেন এ-সব ব্যাপারে বিশদভাবে আমি এখনো আর কিছু জানতে পারি নি।

যা হোক, পূর্বপ্রসঙ্গে আসা যাক। হারমনিয়াম আমাদের দেশের বাদ্যযন্ত্র নয়। অথচ গানের সঙ্গে হারমনিয়াম আজ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে অবশ্য তানপুরা ও সারঙ্গ বাজানোর রীতিই এখনো মেনে চলা হয়। কিন্তু হারমনিয়াম যন্ত্রটির যথাযত প্রচলনের ব্যাপারে শৌরীন্দ্রমোহনই যথার্থভাবে কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। এটি বাজানোর নিয়মকানুন ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা নিয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

শৌরীন্দ্রমোহন 'হারমনিয়াম সূত্র' নামে একটি বই লেখেন।

আজ দেশের চারিদিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার অনেক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ-ব্যাপারেও শৌরীন্দ্রমোহনই প্রথম পথিকৃৎ । সে-কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাজা-মহারাজা, নবাব আর জমিদারদের জলসাঘর ও বাগানবাড়ির মধ্যেই বন্দী হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তখন ছিল বড়লোকদের বিলাস। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শারদোৎসব ইত্যাদি শুভকর্মে বড়-বড় বাঈজী ও ওস্তাদদের গান তখন আভিজাত্যের একটা বড় পরিচয় হয়ে উঠেছিল। বিখ্যাত বাঈজী ও ওস্তাদদের ডেকে আনার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাবও দেখা যেত। অবশ্য কয়েকটি ধনী-পরিবার এই সঙ্গীতচর্চাকে অসাধারণ গুরুত্ব দিয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটাতেই প্রায় পাশাপাশি ছিলেন এমন দুটি পরিবার — একটি ঠাকুর-পরিবার অপরটি ঘোষ-পরিবার। (স্বর্গত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ও স্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষের নাম এ-ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে)।

সে-কালে সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চা বা এই সঙ্গীতের রসগ্রহণ নিতান্ত সহজ ছিল না। শোনবার বা জানবার ইচ্ছে থাকলেও তাদের সে ইচ্ছে পূরণ হত না কারণ এ-গানের অনুষ্ঠান হত বিত্তবানদের বাড়িতে। সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল খাঁটি সমজদারদের। বোধ হয় শৌরীন্দ্রমোহনই প্রথম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহী সাধারণ মানুষের অধিকারকে সসম্মানে স্বীকৃতি জানিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠাদানের ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। দেশবাসী যাতে এই সঙ্গীতচর্চার প্রকৃত সুযোগ পায় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে এ-সম্পর্কে সচেতনতা জাগে এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আজ থেকে একশ' বাইশ বছর আগে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চিৎপুরে 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। কলুটোলায় এর একটি শাখাও ছিল। দুটি কেন্দ্রেই আগ্রহী ছাত্রদের নামমাত্র বেতনে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হত। পরিচালনার ব্যয়ভার প্রায় সম্পূর্ণ শৌরীন্দ্রমোহন নিজেই বহন করতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ মিউজিক' নামে আর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক কত দিন চলেছিল বলা শক্ত। তবে বিশ শতকের প্রথম দশকেও শৌরীন্দ্রমোহন-পরিচালিত

একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা জানা যায় যার উপাধ্যক্ষা ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট গায়িকা যাদুমণি। এ-সম্পর্কে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হবে।[৬] এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় শৌরীন্দ্রমোহন যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে আন্তরিক সাহায্য লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর অগ্রজ যতীন্দ্রমোহন, লোকনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গুরুপ্রসাদ ও লক্ষ্মীপ্রসাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহনের এই প্রচেষ্টার সার্থকতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা আজ একটু কঠিন। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি তখন দেশের ক'জনকে সঙ্গীতজ্ঞ করে তুলতে পেরেছিল তার হিসেব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরিসংখ্যানের এই প্রশ্নটি এ-ক্ষেত্রে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে একদল ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যদি তৈরি না হন তাতেও সঙ্গীতশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য যেমন দেশজোড়া সাহিত্যিক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তৈরি করা নয়, (শিক্ষা সৎ ও সার্থক হলে দেশে যে এঁদের সংখ্যা বাড়বে তা বালাই বাহুল্য), বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে ঐকান্তিক আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা এবং অনুশীলনের প্রেরণা সঞ্চার করা, তেমনি উদ্দেশ্য সঙ্গীতশিক্ষাদানের। 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল' এবং 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ মিউজিক' যদি কিছু সংখ্যক সাধারণ বাঙালির মধ্যেও এই আগ্রহ ও প্রেরণা এনে দিয়ে থাকে তাহলেই শৌরীন্দ্রমোহনের এই প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। এবং তা এনেও দিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে। 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল' প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে ৪ ভাদ্র, ১২৭৯ সালে কলকাতার নর্মাল স্কুলে একটি গানের আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেকালের 'সঙ্গীতসমালোচনী' পত্রিকায় এই আসরের একটি বিবরণী বেরিয়েছিল। এখানে সেই বিবরণী থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল — "তৈলঙ্গ দেশে সংস্কৃত মতানুযায়ী কয়েক প্রকার রীতির গীত অদ্যাপি প্রচলিত আছে; উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গসঙ্গীত সমাজ এই সভার আয়োজন করেন। সভাতে আহূত ও দর্শকে অন্যূন্য ৫০০ লোকের সমাবেশ হয়। গীত সমাপ্ত

হইলে প্রায় সকলের মুখেই আনন্দচিহ্ন লক্ষিত হয়। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর স্বরবিন্যাসচাতুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।"[৭] তৈলঙ্গদেশ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর কণ্ঠে সংস্কৃতমতানুযায়ী বিশুদ্ধ রাগ-সঙ্গীত শোনার জন্যে সাধারণ আসরে পাঁচশ' জন শ্রোতার সমাবেশ কম কথা নয়। এঁদের মধ্যে সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শোনার ইচ্ছা সকলের মধ্যেই প্রবল ছিল। আর প্রতিবেদকের মতে সকলেই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন।

আজকের দিনে যখন দেশে অনেক সঙ্গীতবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে আর প্রতি বছরই ছোটবড় বহু সঙ্গীত-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন, দুঃখের বিষয়, উচ্চমানের সঙ্গীতবিষয়ক একখানি পত্রিকার অভাব ঘুচল না। দু-একখানি যা প্রকাশিত হয় সেগুলি সৎ প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করলেও, উঁচু দরের নয়। আমি এখানে এখন থেকে একশ' একুশ বছর আগে প্রকাশিত একটি সঙ্গীত-বিষয়ক পত্রিকার উল্লেখ করছি যেটি এই বিষয়ে প্রথম বাংলা মাসিক পত্রিকা। নাম — 'সঙ্গীতসমালোচনী', সম্পাদক — ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, প্রকাশকাল — প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১২৭৯। এই পত্রিকাটির প্রকাশ ও পরিচালনার নানা দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন। সঙ্গীতগুরুকে সম্পাদক করে তিনি একরকম নিজেই পত্রিকাটি চালাতেন। প্রথমে এটি প্রকাশিত হত ৫২নং হিদারাম ব্যানার্জী লেন থেকে। তার পর প্রকাশিত হতে থাকে ২নং মির্জাপুর হল্‌ওয়েল্‌স্ লেন থেকে। তবে এটি বেশি দিন চলেনি। এতে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা, সঙ্গীতগ্রন্থের সমালোচনা এবং সঙ্গীতের স্বরলিপি থাকত। আলোচনার ধারা ছিল পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। পত্রিকাটির প্রধান লেখকও ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন। খুব উচ্চমানের না হলেও শিক্ষিত সাধারণ বাঙালির মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে আগ্রহ ও রসবোধ সঞ্চারের ব্যাপারে প্রথম আন্তরিক প্রচেষ্টার নজির হিসাবে আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

এবারে আসি যাদুমণির প্রসঙ্গে। সেকালের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যাদুমণির নামটা বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ায় সমাজের

নীতিবাগীশ নিন্দুকের দল যেন তাঁকে ক্রোধের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল। অবশ্য সে-আগুনের আঁচও শৌরীন্দ্রমোহনের গায়ে লাগে নি। তিনি ও-সব নীচ নীতিবাগীশদের আমল দিতেন না। তবে যখন দেখা যায় শুধু যাদুমণির সঙ্গে সম্পর্কের জন্যে জ্ঞানী-গুণীদেরও কেউ-কেউ তাঁকে হীনদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিলেন তখনই তা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে দুটি-একটি পত্রিকা ছাড়া তাঁর মৃত্যুসংবাদও তখন বিশেষ কোথাও ছাপা হয় নি।

১৯১৪-তে শৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল আগে যাদুমণির মৃত্যু হয়। কিন্তু কে এই যাদুমণি ? তাঁর সঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহনের কী-এমন সম্পর্ক ছিল যা নিন্দনীয় ? ব্যাপারটা রহস্যেই ঢাকা ছিল। এ-কালের সঙ্গীতজগতের কেউ যদি এই রহস্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে যখন ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তখন একদিন কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা আবিষ্কার করি। পুস্তিকাটির নাম 'অর্ঘ্য'। লেখক বিশ্বপতি চৌধিরী বি.এ.। প্রকাশকাল নেই। তবে আমার মনে হয় ১৯১৪-র জুলাই বা আগষ্ট মাসে এটি বেরিয়েছিল। কারণ এই সময়েই শৌরীন্দ্রমোহন মারা যান। এই শতকের একেবারে প্রথম দিকে উত্তর কলকাতায় একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় ছিল যার প্রাণপুরুষ ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন। এই বিদ্যালয় থেকে দু-একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। 'অর্ঘ্য' তেমনি একটি পুস্তিকা। বইটির প্রথমেই লেখা আছে — "সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী স্বর্গীয়া যাদুমণি দেবী — ভূতপূর্ব ভাইস্ প্রিন্সিপাল, সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয় ও সঙ্গীত-নায়ক স্বর্গীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

পুস্তিকাটিতে কি আছে সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। এটির লেখক সে-সময়ের নব্যযুবক সদ্য বি.এ. পাশকরা বিশ্বপতি চৌধুরী, যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুখ্যাত অধ্যাপক হয়েছিলেন। বিশ্বপতিবাবু এখন প্রয়াত। আমি তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র। বিশ্বপতিবাবু তখন অবসর নিয়েছেন। কলকাতার ঝামাপুকুরের বিখ্যাত বনেদী বংশের সন্তান। গুণী ব্যক্তি। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও শিল্পে ও সঙ্গীতেও দক্ষতা ছিল।

বইটা পড়ার পরের দিন সকালেই চলে গেলুম তাঁর কাছে।

আমাকে দেখেই উনি সস্নেহে বলে উঠলেন — "কি রে, তুই যে সাত-সকালে এসে হাজির, কী ব্যাপার?" বলে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং নিজে একটা তাকিয়া কোলে নিয়ে বসলেন।

বললুম, — "স্যার, আমি বিশ্বপতি চৌধুরী বি.এ.-কে আবিষ্কার করেছি।"

শুনে উনি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন — "কী রকম?" তখন তাঁর লেখা পুস্তিকাটি কি ভাবে খুঁজে পেয়েছি তাঁকে জানিয়ে বললুম — "সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহনের ওপর আমি একটা বই লিখতে চাই, স্যার; তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু যাদুমণি সম্পর্কে কেউ বলতে পারছেন না। আপনার লেখা পড়ে মনে হল তাঁর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবেন। তাই এসেছি।"

পুস্তিকাটির কথা শুনে বিশ্বপতিবাবু প্রথমে তো খুব উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এতকাল পরে তাঁর ঐ সামান্য লেখাটা যে কেউ দেখবে এ-কথা উনি ভাবতেই পারেন নি। তাকিয়াটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে ভালো করে এক টিপ্ নস্যি নিলেন। (খুব নস্যি নিতেন)। তারপর বললেন, — "তুই যে শৌরীন্দ্রমোহনের ওপব বই লিখ্ছিস্ জেনে খুব খুশি হলুম। আমাদের সঙ্গীতজগতে অত বড় লোকটার অবদানের কথা আমরা তো ভুলতেই বসেছি। আর যাদুমণি তো হারিয়েই গেছেন। উনি তো ছিলেন সঙ্গীত পরিষদের ভাইস্ প্রিন্সিপাল। কিন্তু আসলে উনি কে ছিলেন জানিস্? — শৌরীন্দ্রমোহনের বাড়ির এক পরিচারিকার মেয়ে।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম — "পরিচারিকার মেয়ে থেকে একেবারে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ভাইস্-প্রিন্সিপাল ? এ তো দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার! কি করে সম্ভব হল ?"

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বপতিবাবু সেদিন যা বলেছিলেন তার সারাংশ। —

আগেই বলেছি বিশ্বপতিবাবু ছিলেন একজন যথার্থ গুণী। তিনি শুধু অধ্যাপক ছিলেন না — ছিলেন চিত্রকর, ছিলেন গায়ক। ঐ বিদ্যালয়েও

প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল যাতায়াত করেছিলেন। সেই সূত্রে শৌরীন্দ্রমোহন ও যাদুমণি উভয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। যাদুমণি ছিলেন সেকালের একজন অসাধারণ গায়িকা এবং সঙ্গীত শিক্ষিকা। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যেও অনেকে পরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যাদুমণির এত বড় গায়িকা হবার তো কথা ছিল না। তিনি তো ছিলেন গরিব পরিচারিকার মেয়ে। মা কাজ করতেন ঠাকুর-বাড়িতে, আর বালিকা যাদুমণি আপনমনে খেলে বেড়াতেন।

একদিন শৌরীন্দ্রমোহনের ঘরে বসে গান গাইছেন বেতিয়া ঘরাণার বিখ্যাত গায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র আর শৌরীন্দ্রমোহন নিবিষ্ট মনে শুনছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটি মেয়ে — ঘরের বাইরে চৌকাঠের কাছে বসে আছে। তিনি উঠে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন — " কে রে তুই?"

রাজা-সাহেবের প্রশ্ন শুনে মেয়েটা খুব ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে সে আত্মপরিচয় দিলে। শৌরীন্দ্রমোহন বললেন, — "তা, তুই এখানে বসে কি করছিস্?" মেয়েটি জানালো সে গান শুনছে। গান তার খুব ভালো লাগে। ঘরে গান হলে প্রায়ই সে এই ভাবে এক কোনে বসে শোনে।

শৌরীন্দ্রমোহন আশ্চর্য হলেন। এতটুকু মেয়ের এত সঙ্গীত-পিপাসা! তাও আবার উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। কিছুই তো বোঝে না। শুধু সুর শুনেই ওর ভালো লাগে! শৌরীন্দ্রমোহনের গলায় আবার বিস্ময় জাগলো — "তুই গান গাইতে পারিস্?" মেয়েটি তখন যেন একটু স্বাভাবিক হল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলে — পারে। শৌরীন্দ্রমোহন আরো আশ্চর্য হলেন। বললেন — "কি গান জানিস্, গা তো শুনি।"

মেয়েটি তখন শুনে-শুনে-শেখা একটা গানের কয়েকটা কলি গেয়েছিল। সঙ্গীত-জগতের জহুরী ও গুণী সমঝদার রাজা-সাহেব তখন মেয়েটির হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে গুরুপ্রসাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন — "এই মেয়ে আজ থেকে আপনার কাছে নাড়া বাঁধলো। আপনি গুরু হয়ে একে ভালো করে তৈরি করুন। আমার মনে হয় এ-মেয়ে বড় গায়িকা হতে পারবে।"

হয়েছিলেন। সেই মেয়েই পরবর্তীকালের বিখ্যাত গায়িকা যাদুমণি। অনেক পরিবর্তন হয়েছিল তাঁর। শিখেছিলেন অনেক কিছু। এবং শেষ জীবনে তিনিই হয়েছিলেন সঙ্গীতবিদ্যালয়ের ভাইস্-প্রিন্সিপাল। সময়টা এই শতকের প্রথম দশক। তখন কলকাতার আকাশে-বাতাসে বড়-বড় বাঈজী আর ওস্তাদদের গান ভাসতো। এ-দেশের 'নাইটিংগেল' বাঈজী গহরজান তখন কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী, বাংলা নানা ভাষায় তিনি নানা রকম গান গাইতেন। সে-যুগে এই শহরে তাঁর গানের আকর্ষণই ছিল সব চেয়ে বেশি। এই সময়ে যাদুমণির পক্ষে সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করা কম কথা নয়। শুধু সনিষ্ঠ সাধনা যাদুমণিকে সেই কৃতিত্ব ও সুনামের অধিকারিণী করেছিল। তবে শৌরীন্দ্রমোহনের অকুণ্ঠ সাহায্য ও প্রেরণাই ছিল তাঁর শিল্পী-জীবনের মূলধন।

নারী-পুরুষের অসামাজিক কোনো সম্পর্কের কথা — তা সত্য বা মিথ্যা যাই হোক — একবার চালু হলে অনেক জল ঘোলা করে। যাদুমণির সঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক নিয়ে এমনিতর একটা ভিত্তিহীন কুৎসা তখন কয়েকজন কট্টর নীতিবাগীশ রটনা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মতো যাদুমণি ও শৌরীন্দ্রমোহনের গুণমুগ্ধ এমন অনেক ব্যক্তি সেদিন এই কুৎসায় কান দেন নি এবং ঐ দুই মহান্ শিল্পীর প্রতি তাঁদের অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগে একটুও ভাঁটা পড়ে নি। সে-কালের আর একজন বিখ্যাত গায়কের কাছ থেকেও আমার এই ধারণার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছিলুম। প্রখ্যাত ধ্রুপদী স্বর্গত সঙ্গীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও তাঁর শৈশবে শৌরীন্দ্রমোহনের ঐ বিদ্যালয়ে কিছু দিন যাতায়াত করেছিলেন। ১৯৬১-র কোনো সময়ে সঙ্গীতাচার্যের ইন্টালীর বাড়িতে গিয়ে এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলুম। তিনিও এই রটনাকে ঘৃণামিশ্রিত অবিশ্বাসের ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দেন এবং যথার্থ শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই কথা বলেন বাংলার সঙ্গীত-জগতের এই দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি খুব কম সময়ের ব্যবধানেই দু-জনের মৃত্যু হয়। যাদুমণি আগে মারা যান। বিশ্বপতিবাবুর এই লেখাটি খুবই দুস্প্রাপ্য

বলে এখানে পুস্তিকাটি থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধার করব। এটি বিশ্বপতিবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাদুমণি ও শৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভায় পাঠ করেছিলেন। এতে যাদুমণির সম্পর্কে প্রথমে কয়েকটি কবিতা ও গান আছে, তারপর আছে তাঁর সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য।—

"বৃহস্পতিবার দিন প্রাতঃকালে সঙ্গীতবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি নগেনবাবু গিয়ে খবর দিলেন, সারা জীবন গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত দেহে যাদুমণি ঘুমিয়ে পড়েছে — আমার বিশ্বাস হল না — সে তো ঘুমোবার মেয়ে নয়, কাল রাত্রেও যে সে কত গান গেয়েছে, মুগ্ধ হয়ে শুনেছি, বিভোর হয়ে বাড়ি ফিরেছি, শয্যায় শুয়ে তার গাওয়া গানের সুরটুকু অনুকরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় অর্ধরাত্র কাটিয়েছি।"(পৃ-১)

দুঃসংবাদ শুনে লেখক ও সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অন্যান্যরা যাদুমণির বাড়িতে যান এবং তাঁর শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। এই শোকসভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে প্রথমে রসরাজ অমৃতলাল বসুকে অনুরোধ করা হয়। তিনি বিরক্তির সঙ্গে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন যাওয়া হয় চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে এবং তিনি সভাপতি হতে রাজী হন।

শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনে একটু মালিন্যের ছোঁয়া হয়তো লাগতেও পারে। পৃথিবীতে এমন অনেক বিখ্যাত শিল্পী আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত জীবন একেবারে অনাবিল নয়। দেখা গেছে তাঁদের কিছু-কিছু কাজকর্ম প্রচলিত নীতিবোধের বিরোধী। কিন্তু তাঁদের জীবনের যেটুকু দিক অপরিচ্ছন্ন তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না তাঁদের শিল্পী-জীবনে। সেখানে তাঁরা সনিষ্ঠ, আপন সৃষ্টির আনন্দে তন্ময়, সমাহিত।

জানি না যাদুমণির চরিত্রে কখনো কোনো মালিন্য ছায়া ফেলেছিল কিনা। যদি ফেলেও থাকে সে-ছায়া শিল্পী যাদুমণির স্বভাবকে আবরিত করতে পারে নি। শিল্পী রূপে তিনি ছিলেন শুদ্ধ সাধিকা। এই প্রসঙ্গে বিশ্বপতিবাবুর মন্তব্য — "চরিত্রহীন শিল্পীর যে পূজা সে পূজা গিয়ে পৌঁছায় স্বয়ং শিল্প-দেবতার চরণে, অথবা আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় সে-পূজার সমস্ত আয়োজন গিয়ে পৌঁছায় আমাদের হৃদয়-দুয়ারে যেখানে

আমাদের ভিতরের শিল্পী পূজা পাবাব জন্যে প্রতিক্ষণে উন্মুখ হয়ে বসে রয়েছে।" (পৃ-৭)। সুতরাং কোনো শিল্পীর মৃত্যুতে একমাত্র শিল্পচর্চারি মাধ্যমেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো যায়। তাই বিশ্বপতিবাবু লিখেছেন — "আজ আমরা কাঁদব না, শোক করব নাঃ আজ আমরা অনুভব করব। আর যদি কাঁদি তো বেহাগে কাঁদব, সাহানায় কাঁদব, বারোঁয়ায় কাঁদব — বেসুরে কাঁদব না।" (পৃ-৮)।

এরপর পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাচ্ছে শৌরীন্দ্রমোহনের ওপর লেখা একটি কবিতা ও তার পরে বিশ্বপতিবাবুর প্রবন্ধ। এই লেখা থেকে আমি কিছুটা দীর্ঘ অংশ উদ্ধার করছি। কারণ এখানে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ও শৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে তখন দেশের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। —

"কিসের শাপে জানি না সেদিন বাংলার সঙ্গীত তার অসংখ্য রাগরাগিণীর সঙ্গে সগরবংশের রাজকুমারদের মতো ভস্মীভূত হয়েছিল। যখন তাদের অস্থিকটামাত্র বাংলার শ্যামকুঞ্জকে শ্মশানের মতো শ্রীহীন করে তুলেছিল সেই সময় যে মহাত্মা বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে ভগীরথের মতো স্বর্গ হতে সুর-মন্দাকিনীকে মর্ত্যে আনয়ন করে বাংলার সেই শ্মাশানভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে করে সেই নির্জীব কঙ্কালগুলি দেখতে দেখতে সজীব হয়ে উঠেছিল আমরা আজ সেই মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই বিরাট সভার আয়োজন করেছি।

"রাজা শৌরীন্দ্রমোহন সেই যুগের লোক, যে-যুগের সবচেয় শিক্ষিত লোকেরা আক্ষেপ করতেন এই বলে যে তাঁরা ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখতে পান না কেন। এমনি একটা বিদ্রোহী যুগের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অটলভাবে সহ্য করে, সমসাময়িক সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত অভ্যাসকে নিজের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, সমসাময়িক রুচি ও পদ্ধতির সমস্ত নেশাব হাত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রেখে যে মহাত্মা আপনার দেশকে তার নিজের প্রাণের কথা শোনাবার জন্যে চেষ্টা করেন, তিনি যে শুধু তাঁর নিজের দেশের গৌরব তা নয়, — তিনি সকল সময় সকল দেশ

এবং সকল জাতির গৌরব। (পৃ-১৫) এ-দেশ যদি তার সঙ্গীতকে ফিরিয়ে পাবার জন্যে কারুর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে তো সে কেবল এই মহাপুরুষের কাছে। কিন্তু এর চেয়ে আক্ষেপের বিষয় আর কি হতে পারে যে আজ পর্যন্ত আমার দেশ তাঁর নাম পর্যন্ত স্মরণ করে না, আজ পর্যন্ত তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে বাংলা দেশ তাঁর স্বর্গগত আত্মার জন্য এতটুকু পিণ্ডরও ব্যবস্থা করেনা। (পৃ-১৭)। ... ইতিপূর্বে স্বর্গীয়া যাদুমণি দেবীর শ্রাদ্ধবাসরে তাঁর স্বর্গগত আত্মাকে যে সম্মান দেখিয়েছিলাম তাতে করে বাংলার কয়েকটি সংবাদপত্র এবং দু-একটি মাসিকপত্র আমাদের নিন্দা করেন।" (পৃ-২৫)। শৌরীন্দ্রমোহনের যে প্রেরণা ও সাহায্য পেয়ে যাদুমণি অতবড় গায়িকা হয়েছিলেন, যে মানবিক স্নেহ-সম্পর্ক নিয়ে একজন পরিচারিকার মেয়েকে তিনি খ্যাতির অধিকারিণী করে সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ভাইস্-প্রিন্সিপাল করেছিলেন, দেশের একদল তথাকথিত সৎস্বভাবের মানুষ তা সহ্য করতে পারেন নি। তা ছাড়া যাদুমণির অপ্রত্যাশিত উন্নতির জন্যে তাঁদের ঈর্ষাও কম ছিল না। নিন্দুকরা তাই যাদুমণির সঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহনের একটা সম্পর্কের কথা গড়ে তুলে নাক সেঁটকাতেন। বিশ্বপতিবাবু এই নিন্দুকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যের শেষ দিকে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। সেটি এখানে উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করি। — "গোলাপ গাছের মধ্যে যাঁরা কাঁটাকেই সত্য বলে মনে করেন রসদেবতা তাঁদের জন্যে কাঁটার বেত তৈরি করে রাখবেন। আর যারা সেই কাঁটার বুকের উপর প্রস্ফুটিত গোলাপকে দেখতে পায়, ও গো রসদেবতা তুমি তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।" (পৃ-২৫-২৬)

তথ্যসূত্র

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ - *'রাগ ও রূপ'*, ১ম ভাগ, পৃ ৮২।
২। O. C. Ganguly - *'Ragas and Raginis'*, P.25.
৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ - *'রাগ ও রূপ'* ১ম ভাগ, পৃ - ৮২।

৪। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী - *'সঙ্গীতসার:'* অনুক্রমণিকা,

৫। Report of the Curator of Musical Collections - The Metropolitan Museum of Art, NewYork, sent to U.S.I.S. Calcutta. U.S. Information Agency, Outgoing message, unclassified, dated Oct.24.1963.

৬। বিখ্যাত সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ ও সেতার এবং সুরবাহার -বাদক ইনায়েৎ খাঁর শিষ্য স্বর্গত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর *'ভারতীয় সঙ্গীত-কোষ'* - গ্রন্থের *'বংশাবলী'* অংশে পাওয়া যায় গোপালকৃষ্ণ চক্রবর্তীর (নুলোগোপাল) শিষ্য সাতকড়ি মালাকার (অন্ধ সাতকড়ি) ''যাদুমণির নিকটও শিক্ষা লাভ করেন।''(পৃ - ২১৪)। এছাড়া যাদুমণির আর কোনো পরিচয় এই গ্রন্থেও পাওয়া যায় না।

৭। *'সঙ্গীতসমালোচনী'* - মাঘ, ১২৭৯।

৩

শৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থাবলী পরিচিতি

শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন সঙ্গীতকলাবিদ্। কিন্তু অন্যান্য বিচিত্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। স্বেচ্ছায় বা অন্যের অনুরোধে তিনি নানা বিষয়ে পড়াশোনা ও তথ্য সংগ্রহ করে এমন-সব বই লিখেছেন যেগুলি তাঁর সঙ্গীতমগ্ন মানসিকতা থেকে আমরা আশাই করতে পারি না। এ-সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষে আলোচনা করা যাবে। কারণ তাঁর প্রধান পরিচয় সঙ্গীতকলাবিদ্ হিসাবে এবং তাঁর সেই পরিচয়কে প্রকাশ করাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।

শৌরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে ১৩২১ সালে শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি শোক-সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি থেকে জানা যায় — "ইঁহার রচিত, প্রকাশিত বা অনুবাদিত অন্যূন ৫০ খানি পুস্তক আছে।" আমার মনে হয় এই সংখ্যাটি যথার্থ নয়। নিজের বই নিজেই প্রকাশ করলেও অন্য কারো বই তিনি প্রকাশ করেছেন বলে জানি না। তা ছাড়া এই সংবাদে — "তাঁহার 'সঙ্গীতসারঃ' নামক পুস্তকখানি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে সর্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই নামে তাঁর কোনো বই নেই। এটির লেখক শৌরীন্দ্রমোহন নয় — ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তার গুরু।

শৌরীন্দ্রমোহন সর্বসমেত ৪৬ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিষয় ও ভাষার ভিত্তিতে সেগুলির একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। —

সঙ্গীতগ্রন্থ	বাংলা	—	৯	খানি
" ..	ইংরেজী ও সংস্কৃত	—	১৭	"
"	হিন্দী	—	১	"

নাটক ও নাট্যধর্মী রচনা, বাংলা	—	৩	খানি
নাট্যতত্ত্বের আলোচনা, ইংরেজী	—	৪	”
সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ	—	১	”
অন্যান্য বিষয়ে ...	—	১১	”
		৪৬	”

এখন সঙ্গীতগ্রন্থগুলি সম্পর্কে প্রথমে সাধ্যমতো আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

সঙ্গীতগ্রন্থাবলী — বাংলা

শৌরীন্দ্রমোহনের বাংলা সঙ্গীতগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমে প্রকাশিত হয় ‘জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৭০)। সমগ্র বইটি বক্তৃতার ভঙ্গীতে লেখা। প্রথমে লেখক দৃশ্য ও শ্রাব্য সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করেছেন। (শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী গীত ও বাদ্য শ্রাব্য ও নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত)। তারপর জগতের অন্যান্য দেশের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকলাবিদ্ ও সঙ্গীত রসজ্ঞদের মতামত আলোচনা করে জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছেন। এখানে ‘জাতীয় সঙ্গীত’ কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আজকাল একটি গানকে আমরা জাতীয় সঙ্গীতের পৃথক মর্যাদা দিয়ে থাকি। সব দেশই দেয়। ইংরেজীতে ‘ন্যাশনাল সঙ্’ বলতে আমরা যা বুঝি এ-গ্রন্থ রচনার সময় তেমন কোনো গান এ-দেশে প্রচলিত ছিল না। মনে রাখতে হবে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসেরই জন্ম হয়েছে এ-বই লেখার পনেরো বছর পরে। জাতীয় সঙ্গীত বলতে শৌরীন্দ্রমোহন কি বুঝেছিলেন বা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই জেনে নেওয়া যাক, — “কোন জাতি-বিশেষের মানসিক অভিপ্রায়ানুরূপ যাবতীয় আভ্যন্তরিক ভাব শুদ্ধ এবং প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায়” যে-সঙ্গীতের মাধ্যমে তাকেই বলা যায় জাতীয় সঙ্গীত। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির নিজস্ব ও বিশিষ্ট সঙ্গীতধারাকেই তিনি ‘জাতীয়’ আখ্যা দিয়েছেন।

এবং — "তাহার রচনা ও ভাবাদির তারতম্য দ্বারাই এক জাতি অথবা এক সম্প্রদায়ের সঙ্গীত হইতে অন্য জাতি অথবা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের সম্যক প্রভেদ অনুভূত হইয়া থাকে।" (পৃ. ৩)।

কিন্তু যুদ্ধের পর বিজিত ও বিজেতা অথবা অন্য কোনো কারণে দুটি পৃথক জাতির মানুষ যখন এক সঙ্গে বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তখন ভাষা, বেশভূষা, রীতিনীতি ইত্যাদির মতো শিল্প ও সঙ্গীতেরও পারস্পরিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। — "মুর্ জাতির সঙ্গীতবিদ্যার দ্বারা স্পেন দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষবিধান ইহার প্রমাণস্বরূপ।" (পৃ. ৩)। লেখক এ-ব্যাপারে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আরো উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন মুসলমান যুগের কথা। মুসলমানগণ হিন্দু সঙ্গীতের উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন এবং – "স্বীয় জাতীয় সঙ্গীতের সহিত ক্রমশঃ তাহা মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে ভারতবর্ষবাসী মুসলমানদিগের সঙ্গীত অনেকাংশে তাহার পূর্বাবিস্থার বিলোপ হওয়ায় ক্রমে এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কারণ তাঁহারা এক্ষণে যে সকল রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেন তৎসমুদয়ের নাম ও ক্রিয়াঙ্গের নিয়মাদি প্রায়ই সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়িক।" (পৃ. ৪)।

সঙ্গীতের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের প্রসঙ্গও লেখক এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া কাব্য ও চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ, চিত্রে বর্ণ-সমন্বয় ও সঙ্গীতে স্বর-সমন্বয়ের রীতি-পদ্ধতি, এ-দেশে পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীতের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর দশাবতার স্তোত্র এবং কয়েকটি বৈদিক স্তোত্রের স্বরলিপিও বইটিতে দেওয়া হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন পূর্বকালে ভারতবর্ষে স্বরলিপি রচনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সঙ্গীতজ্ঞরা সেই লিপির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গীতকে ধরে রাখতেন। পরবর্তীকালে নানা কারণে সে-পদ্ধতিকে আর সঠিকভাবে জানা যায় না।

গ্রন্থের প্রতি ছত্রে লেখকের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

একালে তাঁর মতকে যদিও সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না তবু তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে না। গ্রন্থের শেষে লেখক তাঁর গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীত-প্রতিভা এবং তাঁর 'সঙ্গীতসারঃ' বইটির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

এরপর শৌরীন্দ্রমোহনের চারখানি গ্রন্থ বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত — 'যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা' (১৮৭২), 'মৃদঙ্গমঞ্জরী' (১ম সং. ১৮৭৩ ও ২য় সং. ১৯০২), 'হারমনিয়াম সূত্র' (১৮৭৪) এবং 'যন্ত্রকোষ' (১৮৭৫)। এগুলির মধ্যে 'হারমনিয়াম সূত্র'-এর কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৭৫-এ লেখকের 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ' নামে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' বইটি হল — 'A treatise on Citara'. অর্থাৎ সেতার শিক্ষার বই। শৌরীন্দ্রমোহনের এই বইটি প্রকাশ করেন সেকালের আর একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪২ - ১৯০০)। ইনি শৌরীন্দ্রমোহনের'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল'-এর শিক্ষক ছিলেন। প্রথম জীবনে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে, শুধু এ-দেশে নয় বিদেশেও খ্যাতি অর্জন করেন। বার্লিন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ থেকে ইনি অনেক প্রশংসা-পত্র ও পদক লাভ করেছিলেন। হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক এড্ওয়ার্ড্ রেমিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন। তিনি কালীপ্রসন্নের সেতার বাদন শুনে মুগ্ধ হন। কালীপ্রসন্ন সুরবাহার ও ন্যাস-তরঙ্গও সমান দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। ইনিও ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য এবং শৌরীন্দ্রমোহনের বিশিষ্ট বন্ধু। সে-আমলে সেতার শিক্ষার পদ্ধতি কেমন ছিল বইটি থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। অনেক রাগের গৎ রচনার ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে তাঁর গুরুরও নাম পাওয়া যায়। তাই মনে হয় বইটি রচনার ব্যাপারে তিনি ক্ষেত্রমোহনের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন।

'মৃদঙ্গমঞ্জরী' মৃদঙ্গ শিক্ষার বই। আনদ্ধ শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে (অর্থাৎ যে সব বাদ্যযন্ত্র চর্মাচ্ছাদিত) মৃদঙ্গ অতি প্রাচীন। এ-যন্ত্র বাজানোও সহজ নয়।

गीतावली

वा

हिन्दी भाषा का कण्ठ-सङ्गीत।

श्रीसौरीन्द्रमोहन ठाकुरने मिउजिक डाक्टर,

कलकत्ता बङ्गसङ्गीत [illegible], कलकत्ता इउनिवर्सिटिका फेलो,

इत्यादि, इत्यादि,

[illegible] हुआ।



कलकत्ता।

आइ, सि. बसु कोम्पानिसे २४५ नं बहुबाजार ष्ट्रीटमे

ष्टान्होप् यन्त्रमे छापा हुआ।

१८७८।

হিন্দী 'গীতাবলী' গ্রন্থের নামপত্র

লেখক সংস্কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মৃদঙ্গের উৎপত্তি, নির্মাণ-প্রণালী, বন্ধন-নিয়ম, ধারণপ্রথা, মাত্রাবিবরণ, লয়, হস্তপাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া মৃদঙ্গে ব্যবহৃত অষ্টাদশ তাল, অনেক প্রাচীন তালের নাম ও সেগুলির প্রাচীন ও আধুনিক মাত্রাসংখ্যাও বইটিতে পাওয়া যাবে।

বাদ্যযন্ত্র-বিষয়ক বইগুলির মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনের 'যন্ত্রকোষ' বইটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ-ধরনের কোন বই সে-যুগে বা এ-যুগে আর কেউ লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই। সেকালের অনেক বইতে ইংরেজী ও বাংলা দু-ভাষাতেই নামপত্র (title page) থাকত। এই বইএর ইংরেজী নামপত্রে লেখা আছে — "A treasury of the musical instruments of ancient and of modern India, and of various other countries." এটি 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের' সভাপতি রূপে তিনি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন। আমরা জানি শৌরীন্দ্রমোহন নানা রকম বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রাহক ছিলেন। বিস্ময়কর প্রাচীন দ্রব্যাদি সংগ্রহে অনেকের নেশা থাকে। বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে শৌরীন্দ্রমোহন যদি শুধু তাঁর নেশাতেই আবদ্ধ থাকতেন তাহলে বেশি কথা বলার ছিল না। দেশী-বিদেশী বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস, গঠন-কৌশল ও বাদনরীতি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। নেশার সঙ্গে জ্ঞানের এমন্ সমন্বয় সব যুগেই দুর্লভ।

হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের চারটি ভাগ — 'তত' অর্থাৎ তন্তু বা তারের যন্ত্র, 'শুষির' অর্থাৎ বায়ু-বাদিত যন্ত্র, 'আনদ্ধ' অর্থাৎ যে বাদ্যযন্ত্র চামড়া দিয়ে তৈরি হয় এবং 'ঘন' অর্থাৎ ধাতুনির্মিত যন্ত্র। এই চার ধরনের বহু যন্ত্রের মধ্যে অনেক অদ্ভুত নাম পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'তত' শ্রেণীর মধ্যে বীণা, সেতার, রবাব ইত্যাদির সঙ্গে রয়েছে — দেওড়া, কানুন, মোচঙ্গ ইত্যাদি; 'শুষির' শ্রেণীর মধ্যে বাঁশী, বেণু, শঙ্খ ইত্যাদির সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে বুক্কা, গোমুখ, কলম, তুবড়ি ইত্যাদি; 'আনদ্ধ' শ্রেণীর মধ্যে মৃদঙ্গ, তবলা, খোল প্রভৃতির সঙ্গে রয়েছে ঘুটরু, ডম্ফ, হুড়কা, চর্চরি ইত্যাদি এবং 'ঘন' শ্রেণীর মধ্যে কাঁসর, ঘন্টা ইত্যাদির সঙ্গে রয়েছে খটতালী।

এইভাবে সমস্ত বাদ্য যন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করার পর লেখক প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সভ্য দেশেরও অনেক বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে চমৎকার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশটিও যথেষ্ট মূল্যবান। কারণ — ''ভারতবর্ষীয় লুপ্ত, প্রাচীন ও কতকগুলি প্রচলিত যন্ত্রের এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দেশের বাদ্যযন্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতদূর সম্ভব দৃঢ়তর অনুসন্ধান দ্বারা পাওয়া গিয়াছে তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।'' (পৃ. ১২৩)। লেখকের এই জাতীয় আর একখানি ইংরেজী বই প্রকাশিত হয়। ইংরেজী গ্রন্থের আলোচনা -প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

শৌরীন্দ্রমোহনের আর একখানি বাংলা সঙ্গীত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় ও. সি. গাঙ্গুলীর 'Ragas and Raginis' শীর্ষক গ্রন্থে। বইটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। বইটির নাম 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ'। গ্রন্থটি সম্পর্কে ও. সি. গাঙ্গুলী লিখেছেন — 'The compilation of Raja Sir Sourindra Mohan Tagore (one of the greatest connoisseurs and patrons of Indian Music) under the title of 'Samgita-Sara-Samgraha' and published in Sambat 1932 (1875 A. D.) offers the latest study on the old Sanskrit musical texts.'' (pp. 36-37).

রাজভক্তি প্রকাশের ব্যাপারে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারে অতিমাত্রিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। এই পরিবারে বিভিন্ন রাজসম্মানের ভূষণ এই ভক্তির ই প্রতিদান। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন 'মহারাজা' এবং শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন 'রাজা'। 'নাইট' উপাধি দুজনেরই ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে এমন রাজসম্মানের ছড়াছড়ি দেখা যায় না। রাজপুরুষের মতো ঐশ্বর্য, বেশভূষা আর চাল-চলনের জন্যে লোকে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সম্মান জানিয়ে বলতো 'প্রিন্স'। সেটা তাঁর সরকারী খেতাব নয়। তাঁর পুত্র দেবন্দ্রনাথ 'মহর্ষি'। তাঁর পুত্রদের মধ্যে যাঁকে বিদেশী সরকার 'নাইট্' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল তিনিও বেশি দিন সেই উপাধির গুরুভার বহন করতে পারেন নি।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবেরের রাজভক্তি প্রকাশের এই আতিশয্য শৌরীন্দ্রমোহনের কতকগুলি সঙ্গীত-গ্রন্থে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে একটি বাংলা ও অপরগুলি ইংরাজী অনুবাদ-সম্বলিত সংস্কৃত-গ্রন্থ। বাংলা বইটির নাম 'ভিক্‌টোরিয়া গীতিমালা' (১৮৭৭)। এ-দেশের শিক্ষিত মানুষ তখন মহারাণী ভিক্‌টোরিয়াকে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার ত্রাণকর্ত্রী বলে মনে করত। কিন্তু দু-একজনের লেখায় মহারাণীর কাছে সবিনয় নিবেদনের সঙ্গে একদল সাহেবের অকথ্য অত্যাচার ও তাদের কুৎসিত চরিত্রের কথাও প্রকাশ পেয়েছে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পাঁচটি গান লিখেছিলেন। ব্যঙ্গ-সঙ্গীত। প্রথম গানটিতে তিনি মহারাণীর যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে কবির দেশাত্মবোধের সার্থক পরিচয়। কবি লিখেছেন —

"কোথা রইলে মা বিক্‌টোরিয়া, মা গো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে , সবাই বিমর্ষে ।"

তারপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-প্রসঙ্গে তাদের স্বভাবের পরিচয় দিচ্ছেন—

কুটেল সব সাহেবজাদা ধপ্ ধপে বাইরে সাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়"।

কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহনের বাংলা বা ইংরেজী কোনো লোখায় এই ধরনের মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না।

বইটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মারা পরমার্থ বিষয়ক অনেক গান রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলি কিশোর-মনের উপযুক্ত নয়। কারণ গানগুলির আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্য অল্পবয়সী কাঁচা মনের ওপর রেখাপাত করতে পারে না। এই বিবেচনায়, লেখক লিখেছেন— "তরলমতি বালকগণকে প্রথমতঃ নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপদেশ দেওয়াই

নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। এই সকল বিবেচনায় মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার 'রাজরাজেশ্বর' এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যে 'ইংলন্ড ও ইণ্ডিয়া' নামক এই ঐতিহাসিক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রস্তুত হইল।'' তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই বইতে এক অদ্ভুত প্রয়াসের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন লেখক, অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গীতের গাঁটছড়া বাঁধার চেষ্টা। (সে-ইতিহাসও যে কতটা প্রকৃত ইতিহাস, সে-সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে)। বইটির দুটি অংশ – 'ভিক্‌টোরিয়া গীতিমালা' ও 'ভারতীয় গীতিমালা'। প্রথম অংশে ''দয়াময়ী জননী-স্বরূপিনী'' মহারাজ্ঞীর পূর্বতন রাজগণের কথা এবং দ্বিতীয় অংশে প্রধানত হিন্দু-মুসলমান রাজা-বাদশাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় অংশেও বৃটিশ রাজশক্তির অকুণ্ঠ গুণগান করা হয়েছে।

'তরলমতি বালকগণকে' নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী এবং তাল-লয়ের সাহায্যে যে ইতিহাস লেখা যায় এ-কথা বোধ হয় সেদিন শৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারেন নি। আজও পারেন না। আগে অবশ্য এ-দেশে চারণ-কবির দল ইতিহাস গাইতেন। তাছাড়া ইতিহাস-কথার সাহায্য নিয়ে দেশাত্মবোধক গান এ-যুগেও লেখা হয়েছে। কিন্তু মার্গ-সঙ্গীতের নির্দেশ মেনে বালকদের ইতিহাস ও নীতিশিক্ষার এমন বই বোধ হয় এই প্রথম। তবে একে যে কেউ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের বই বলে গ্রহণ করবেন সে-আশা সেদিন বোধ হয় লেখক নিজেও করেন নি।

এই ধরনের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শৌরীন্দ্রমোহন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাহায্য নিয়েছেন আরো একটি গ্রন্থে। বইটির নাম 'গীত-প্রবেশ' (১৮৮৩)। – ''সুকুমারমতি নিতান্ত শিশুগণের শিক্ষোপযোগী করিবার নিমিত্ত গ্রন্থখানি যতদূর সরল হওয়া অবশ্যক, তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করা যায় নাই।'' (ভূমিকা)। প্রথমেই বলে রাখি এমন বইও সেকালে বা একালে বোধ হয় আর কেউ লেখেন নি। বইটি মূলত সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ক হলেও ''সুকুমারমতি নিতান্ত শিশুগণের'' অন্তরে নীতিবোধ জাগানোর সচেতন প্রচেষ্টা গানগুলির মধ্যে থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে। গান না বলে এগুলিকে নীতিমূলক ছাড়া বলাই ভালো। প্রতিটি ছড়াই রাগ-রাগিণীর সুর-তালে আবদ্ধ। স্বরলিপিও

দেওয়া আছে। এই জাতীয় ছড়াগুলিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বাঁধন যে কতটা উপযুক্ত হয়েছে সে-প্রশ্ন না তোলাই ভালো। আর শিশুরাও যে কতটা নীতিশিক্ষা লাভ করেছিল আজ তা অনুমান করাও কঠিন। এখানে এই বিচিত্র উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের দুটি উদাহরণ উদ্ধৃতি হল। —

এক। রাগিণী শংকরা। সম্পূর্ণ।

তাল - একতালা।

ঐ শুন ডাকছে কোকিল
কি মধুর রব মনোহর।
গুণ আছে বলে ওরে, সবাই এত আদর করে,
গুণের জোরে কালো কোকিল সবার কাছে পায় আদর।

দুই। রাগিণী সুরট জয়জয়ন্তী। সম্পূর্ণ।

তাল—একতালা।

কাল পাঠশালে যাইবার কালে
পালেদের নিবারণ
সদর দুয়ারে একটি কাণারে
করেছিল দরশন।
তাহারে দেখিয়া অমনি ছুটিয়া
বাটীর ভিতরে গিয়ে,
একটি দু-আনি দিল তারে আনি
সুখী সে হইল নিয়ে।
দু হাত তুলিয়ে কত কি বলিয়ে
আশীষ করিল কাণা,
হাজার টাকার বিষয় তাহার
হল পেয়ে দুই আনা।

রচনা নিঃসন্দেহে দুর্বল। দু-আনা পেয়ে কাণার হাজার টাকার বিষয় কি করে হয় তা চিন্তার বিষয়। তবে লেখক বোধ হয় বলতে চেয়েছেন দু-আনা পেয়ে কাণার উচ্ছ্বসিত আনন্দের কথা। গান মনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ

করতে পারে, হৃদয়বৃত্তির বিকাশ-সাধনে সাহায্য করতে পারে। এমন কি অনেক রোগ নিরাময় পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহনের এই গানগুলি রচনার উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হয়েছিল বলা শক্ত। কারণ রাগ-রাগিণীর সুর-তালে বাঁধা এই ধরনের নীতি-উপদেশ-মাখানো ছড়া বা কবিতার সঙ্গীতরস কোনো অবস্থার মনের ওপরেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

শৌরীন্দ্রমোহনের বাংলা সঙ্গীতগ্রন্থগুলির মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই 'সঙ্গীত শাস্ত্র প্রবেশিকা' (১৮৮৪)। এর পর তাঁর আর কোনো বাংলা সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। — "এ-পর্যন্ত যতগুলি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে তন্মধ্যে এমন একখানিও গ্রন্থ নাই যাহা দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্র-সম্মত সঙ্গীতের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।" (ভূমিকা)। এই অভাব মোচনের জন্যেই শৌরীন্দ্রমোহন বইটি লেখেন। অবশ্য বিষয়বস্তুর অনুপুঙ্খ আলোচনায় লেখক প্রবেশ করেন নি। সে উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। শাস্ত্রীয় অর্থে সঙ্গীত বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য – সে-সম্পর্কে সমস্ত বিষয় ও আঙ্গিকের সাধারণ আলোচনা এতে আছে। প্রবেশিকা-গ্রন্থ হিসাবে বইটি যথার্থই মূল্যবান।

সঙ্গীত-গ্রন্থাবলী : ইংরেজী, সংস্কৃত-ইংরেজী ও হিন্দী —

শৌরীন্দ্রমোহন ইংরেজীতে এবং ইংরেজী অনুবাদসহ সংস্কৃতে মোট সতেরোখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। এবং হিন্দীতে মাত্র একখানি। তাঁর প্রথম ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয় পাঁচখানি বাংলা গ্রন্থের পর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। কখনো-কখনো বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থরচনার কাজ তিনি এক সঙ্গে চালিয়েছেন, এবং কোনো-কোনো বছরে তাঁর বিভিন্ন ধরনের তিন-চারখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, যে বছরে তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন অথবা হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার ওপর ইংরেজী বই লিখেছেন অথবা মাণিমাণিক্য নিয়ে ইংরেজীতে মূল্যবান আলোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই বছরেই বাংলা বা ইংরেজীতে তাঁর এক

বা একাধিক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

শৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ 'Hindu Music' - Part-I প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এটি তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা নয় — একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংকলনগ্রন্থ। সেকালের ইতিহাস বলে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে,ব্ল্যাক নেটিভ্‌দের ওপর দীর্ঘকাল অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে । এ-সব কথা নির্জলা সত্য হলেও তাদের মধ্যেই আবার অনেকে ছিলেন শিল্পী ভাবুক প্রেমিক ইংরেজ। তাঁরা ভারতবর্ষকে ও এ-দেশের কালা আদমিদের ভালোবেসে তাদের সুদীর্ঘকালের সুমহান ঐতিহ্যকে জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের সে-আগ্রহ ছিল আন্তরিক। 'Scicntific Intelligence'এবং এই জাতীয় কয়েকটি নামকরা পত্রিকায় সে-সময় কয়েকজন বিদগ্ধ ইংরেজ হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন এই গ্রন্থ। এই বিদেশী লেখকদের মধ্যে আছেন Sir William Jones, Capt. N. Augustus Willard, J. D. Paterson, William C. Stafford, John Davy প্রভৃতি। হিন্দু-সঙ্গীত ও এ-দেশে প্রচলিত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এঁরা বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এ-ধরনের বই আগে আর প্রকাশিত হয় নি। হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে তৎকালীন বিদেশী চিন্তানায়কদের চিন্তার রীতি ও গভীরতার পরিচয় এই বইটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। এ-বিষয়ে এঁদের ধারণা ও বিশ্লেষণে যাথার্থ্যের পরিমাণ কতটা তা সঙ্গীতকলাবিদ্‌দের বিচার্য বিষয়। কিন্তু হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রেক্ষার দিক থেকে এ-গ্রন্থের গুরুত্ব আজকের দিনেও যথেষ্ট।

এই বইটির দ্বিতীয় অংশ পৃথকভাবে প্রকাশিত হবার কথা ছিল । আলোচ্য প্রথম খন্ডের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন, হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরেজীতে লেখা প্রায় সমস্ত মূল্যবান রচনাই এতে থাকবে, আর দ্বিতীয় খন্ডে থাকবে সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা এবং হিন্দু-সঙ্গীত সম্পর্কে বিভিন্ন য়ুরোপীয় লেখকের মতামতের সমালোচনা। কিন্তু লেখক কয়েক বছর পরে বইটির দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ না করে পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ

করেন(১৮৮২)। এই সংস্করণের ভূমিকায় লেখক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন - "As I have already published a Dissertation on Indian Music under the designation of 'Six Principal Ragas of the Hindus', I have thought it unnecessary to give in this work my own views on the subject, such as I had promised to do, while bringing out the first edition."

এই সংস্করণে বইটিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটি প্রথম সংস্করণের অনুবৃত্তি এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে তিনটি প্রবন্ধ। প্রথম দুটি দুজন বিদেশী লেখকের – George C. M. Birdwood. 'Industrial Art of India'-থেকে উদ্ধৃত বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক রচনা এবং R. H. M. Bosanquet.-এর হিন্দু-সঙ্গীতের স্বর-বিন্যাস সম্পর্কে একটি লেখা। তৃতীয় লেখাটি হিন্দু-সঙ্গীত সম্পর্কে শৌরীন্দ্রমোহনের রচনা। এটি আগে 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকায় বেরিয়েছিল (৭.৯.১৮৭৪)। আর একটি মূল্যবান জিনিস এতে আছে – বসন্ত রাগের ওপর একটি প্রাচীন সংস্কৃত স্বরলিপি।

এই বছরে (১৮৭৫) শৌরীন্দ্রমোহনের আরো দুখানি ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয় – 'English Verses Set to Hindu Music' এবং 'Victoria Gitika'. পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-পরিবারে রাজভক্তি প্রকাশের ব্যাপারে যে মাত্রাধিক্য ঘটেছিল এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। তবু একটা কথা মনে রাখতে হবে, রাজভক্তি কখনো তাঁদের আত্মবিস্মৃত ক'রে পশ্চিমী সভ্যতার অন্ধ অনুকারী করে তোলে নি।

English Verses Set to Hindu Music' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল – "In honor of His Royal Highness, the Prince of Wales". প্রথমে আছে যুবরাজের উদ্দেশ্যে লেখা দুটি স্বাগত-সঙ্গীত। প্রথমটির রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তারপর গ্রে, কাউপার, সাউদি, ক্যাম্প্‌বেল প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির কয়েকটি কবিতাকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ছাঁচে ঢেলে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সেগুলির স্বরলিপি রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দু-সঙ্গীতের রীতি-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা

আছে। এ-দেশীয় সঙ্গীত-রীতিতে ও-দেশীয়দের পারদর্শী করে তোলার কোনো উদ্দেশ্য এই-জাতীয় গ্রন্থ রচনার পিছনে ছিল বলে মনে হয় না। কারণ শৌরন্দ্রমোহন ভালোই জানতেন যে হিন্দু-সঙ্গীতের রীতি-পদ্ধতিকে – চিন্তাগত নয়, কণ্ঠগত করতে হলে সদ্‌গুরুর সাহায্য ও সাধনার প্রয়োজন আছে। গানের বই পড়ে আর গান শুনে গানের সমালোচক হওয়া যায়, গায়ক হওয়া যায় না। তবু যে এই ধরনের বই তিনি রচনা করেছিলেন, জাতীয় পদ্ধতিতে রাজভক্তি প্রকাশই তার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। টম্‌সনের 'রুল্ ব্রিটানিয়া' কবিতাটি হামীর-কল্যাণ রাগে অথবা রেভারেণ্ড সি . উল্‌ফের 'বেরিয়াল অব্ সার্ জন্ মুর্' কবিতাটি ভূপালী রাগে গাইলে কেমন শোনাবে এবং সেই অশ্রুতপূর্ব রাগ-সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে রাগ দুটির রূপ কতটা ফুটে উঠবে বলা শক্ত। কিন্তু এর ফলে যে আগ্রহী বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞের অন্তরে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হতে পারে এ-আশা বোধ হয় তিনি পোষন করতেন।

'Victoria Gitika' ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের সংস্কৃত কাব্যরূপ – ভিকটোরিয়ার পূর্ববর্তী ইংল্যাণ্ডীয় রাজন্যবর্গের প্রশস্তি। এক পৃষ্ঠায় কোনো বিশেষ রাজা বা রাজ-পরিবার সম্পর্কে কয়েক ছত্র সংস্কৃত রচনা ও অপর পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ। বলা বাহুল্য প্রতিটি সংস্কৃত রচনাই কোনো বিশেষ রাগ বা রাগিণীর আশ্রয় লাভ করেছে। এবং সেগুলির দেশী বিদেশী দু-রকম পদ্ধতিতেই স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। ভূমিকায় লেখক তাঁর রাজভক্তির কথা স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন — "To impart Englishmen an insight into the nature of our Ragas and Raginis, these pieces have been set to Hindu Music"

অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গীত-বিষয়ক অন্যান্য ইংরেজী আলোচনা-গ্রন্থের মূল্যই সবাধিক। দু-বছর পরে সঙ্গীতের মাধ্যমে ছাত্রদের ইতিহাস শিক্ষা দেবার জন্যে শৌরীন্দ্রমোহন 'ভিক্টোরীয়া গীতিমালা' নামে যে বাংলা বইটি রচনা করেন (যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে) সেটি বহুলাংশে এই ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ।

'Six Principal Ragas' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির প্রথম সংস্করণ আমি পাই নি। এই সংস্করণে লেখক ছটি প্রধান রাগের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন – শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ ও নটনারায়ণ। এতে তাঁর রাগ-রাগিণী-বিষয়ক প্রাচীন ধারণারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রে আছে, মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত ও মেঘ এই পাঁচটি এবং পার্বতীর মুখ থেকে বৃহন্নট বা নট্‌নারায়ণ রাগের জন্ম হয়। এই ছ'টি রাগের আবার ছ'টি করে স্ত্রী। এই ভাবে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর কল্পনা করা হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীতসারঃ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ষোলো হাজার, তারা উপরাগ ও উপরাগিণী। পরবর্তী কালে এই-সব রাগ-রাগিণীর সংযোগে বড়-বড় সঙ্গীতজ্ঞরা আরো অনেক মিশ্ররাগ সৃষ্টি করেছেন। মল্লার, টোড়ি, কল্যাণ ইত্যাদি বিভিন্ন রাগের নানা রূপ দেখা দিয়েছে। শুদ্ধ রাগ কম গায়ক বা বাদকেই গেয়ে বা বাজিয়ে থাকেন। সে যাই হোক, শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর এই গ্রন্থে শুধু স্বরলিপি দিয়ে নয়, চিত্র-পরিচিতির সাহায্যেও ছ'টি রাগের রূপ সম্বন্ধে পাঠকের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রীতিপদ্ধতির আলোচনা ও তার পাশ্চাত্য সঙ্গীতরীতিসম্মত ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। আর পরিশিষ্টে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর সামান্য পরিচয় আছে স্বরলিপি সমেত। অপূর্ব ধ্বনিলাবণ্য ও সুর-সুষমায় সমৃদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' বর্তমান সঙ্গীতজ্ঞদের ওপর তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। অথবা বর্তমান সাঙ্গীতিক 'প্রগতির' ধাক্কায় তাঁরা এই প্রাচীন গানের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। অবশ্য দু-একজন সঙ্গীত-সাধকের কণ্ঠে সেই অনুপম সুর-মাধুর্য এখনো বাসা বেঁধে আছে, এটাই আশার কথা।

এই বছরেই (১৮৭৭) শৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয় – 'Short Notices of Hindu Musical Instruments'.এই ধরনের একটি বাংলা বই তাঁর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'যন্ত্রকোষ' নামে। সে-গ্রন্থের আলোচনা আগে করা হয়েছে। তাতে

আলোচনার গণ্ডী ছিল একটু বড়। দেশী-বিদেশী নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের কথাই তাতে ছিল। কিন্তু এতে আছে শুধু এ-দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের কথা। বোঝাই যাচ্ছে হিন্দুদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আত্মকথা বিদেশীদের জানানোই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। বইটি ছোট। পকেট-বুক ধরনের। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৩। স্বল্পায়তন হলেও বইটি মূল্যবান। মুখবন্ধে লেখক বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে প্রাথমিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। লেখক বলেছেন এমন কয়েকটি অসভ্য বা অর্ধ- সভ্য মানব-গোষ্ঠী এখনো জগতে আছে যাদের মধ্যে পাঁচটির বেশি সংখ্যাচিহ্ন নেই। তাই তারা হাতের আঙুল গুনতে দু-হাতের আঙুলের সংখ্যার হদিশ পায় না, শুধু এক হাতের পাঁচটা আঙুলই গুনতে পারে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, এই ধরনের মানব-গোষ্ঠীরও গান বা নাচের সঙ্গে বাজানোর জন্যে বিশেষ ধরনের বাদ্যযন্ত্র আছে। প্রগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির বুকে আবদ্ধ সঙ্গীতকে মুক্ত করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে। বিভিন্ন পশুর শিং, শরীরের হাড়, চামড়া, কেশগুচ্ছ, অস্ত্র, লতানে উদ্ভিদের শিকড়, ধ্বন্যাত্মক (sonorous) পাথর, নানা রকমের ধাতু ইত্যাদির মধ্যে থেকে মানুষ সুরকে টেনে বার করেছে। সুরকামিনী প্রকৃতির বুকে সুরের সুরধুনী বইছে অনন্তকাল, অবারিত। সবাই সে-সুর শুনতে পায় না, যারা পায় তারা তাকে প্রথমে কানে ধরে তারপর যন্ত্রে বাঁধে। অবশ্য যন্ত্রে সুরের এই বন্ধনও আসলে বন্ধন নয়, একটা রূপকে আশ্রয় করে সে-সুর যন্ত্রের মধ্যেই মুক্তগতি। তা না হলে সঙ্গীত হত না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারের পিছনে আদিম মানব-মনে যে-বাসনাটি লুকিয়েছিল শৌরীন্দ্রমোহন তার একটি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, —

"The original conception which led the primitive people to the invention of musical instruments was the idea of keeping time which they had acquired by an attention to the beatings of the pulse or to their manner of walking."(PP.viii - ix).

শৌরীন্দ্রমোহনের মতে মৃদঙ্গ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রাচীনতম। মুখবন্ধে লেখক অনেকগুলি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং সেগুলির সঙ্গে মিল আছে এমন কয়েকটি বিদেশী যন্ত্রের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের মূল অংশটিতে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সমেত বিভিন্ন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের একটি দীর্ঘ তালিকা আছে — বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। বহু প্রাচীন ও অধুনা-অপ্রচলিত দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় এই তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। এদের অনেকগুলির উল্লেখ 'যন্ত্রকোষ' গ্রন্থেও আছে। 'কলম'একটি শুষির পর্যারের বাদ্যযন্ত্র (wind instrument). দেখতে ছিল কলমের মতো। তাই এই নামকরণ। 'মোচঙ্গ' তত পর্যায়ের আর একটি বাদ্যযন্ত্র (Stringed instrument).খুব প্রাচীন ও অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র এটি। যন্ত্রটি নাকি বাঁ হাতে ধরে দাঁত দিয়ে চেপে রেখে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাজাতে হত। এই রকম আনন্দলহরী, বুক্কা, রঞ্জনী, চর্চরী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় লেখক উদ্ধার করেছেন। বিদেশীদের কাছে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র সম্ভারের ঐশ্বর্য এমন ঐকান্তিক পরিশ্রমে তুলে ধরার চেষ্টা আর কেউ করেন নি।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭৮-এ শৌরীন্দ্রমোহনের তিনখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে দুখানি ইংরেজীতে — 'Fifty Tunes' এবং 'A Vedic Hymn' . অপরটি হিন্দী ভাষায় — 'গীতাবলী'।

কয়েকজন বিদেশী বন্ধুর অনুরোধে 'Fifty Tunes' বইটি শৌরীন্দ্রমোহন রচনা করেন। এতে অনেকগুলি রাগ-রাগিণীকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির স্বরলিপিতে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে এই সব রাগ-রাগিণী পিয়ানো বা অন্য বিদেশী যন্ত্রে বাজানো যায়। এই-জাতীয় স্বরলিপি রচনার পদ্ধতি, অর্থাৎ এ-দেশীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের স্বরলিপিকে পাশ্চাত্য 'নোটেশন'-এ নিয়ে যাওয়া শৌরীন্দ্রমোহনের নিজস্ব উদ্ভাবন। এর ফলে রাগ-রাগিণীর রূপের কোনো বিকৃতি যাতে না ঘটে সে-দিকেও তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও লেখকের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল বলেই এ-কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

'A Vedic Hymn' মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার একটি লম্বা-চওড়া বই। কোনো

বৈদিক স্তোত্র নয়। তিনটি রাগিণীর সাহায্যে লেখক বোধ হয় বৈদিক স্বরবিন্যাসরীতিকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। রাগিণী তিনটি হল — কুকুভা, খাম্বাবতী ও সৌরাটী। এই তিনটি রাগিণীর সঙ্গে ব্যবহৃত তিনটি তাল হল যথাক্রমে চৌতাল, সুর-ফাঁকতাল ও মধ্যমান।

এই বছরে শৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল হিন্দী ভাষায় রচিত 'গীতাবলী'। হিন্দিতে লেখকের তেমন দখল ছিল না। কিন্তু ভাষাগত দু-একটি ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে তাঁর প্রচেষ্টাকেই তারিফ করতে হয়। শ্রুতি, গ্রাম, মাত্রা, গমক, মূর্চ্ছনা, আলাপ, সর্‌গম্, তেলেনা, খেয়াল, ধ্রুপদ, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে লেখক বেশ সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। মনে রাখতে হবে বইটি – "প্রাইমার্ স্কুল কা লেড়কা-লোককে শিখনে কে ওয়াস্তে হিন্দি ভাষামে তৈয়ার হুয়া"। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পণ্ডিতী আলোচনা-গ্রন্থ এটি নয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের মাত্র একখানি ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'A Few Specimens of Indian Songs.' এটি তাঁর এক অভিনব রচনা। সে-যুগে এমন বই আর কেউ লেখেন নি। মার্গ-সঙ্গীতে শৌরীন্দ্রমোহনের দখল ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে এই সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশে তাঁর মতো জ্ঞান সেকালে বোধ হয় আর কারো ছিল না। অথচ এই গ্রন্থে দেখা গেল সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতপ্রেমী হিসাবে তাঁর এক ভিন্ন পরিচয়। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে এ-দেশে প্রচলিত নানা রকমের লোক-সঙ্গীতের উদাহরণ এবং সেগুলির বৈশিষ্ট্যের কথা এতে আছে – বাংলায় এবং তার ইংরেজী অনুবাদে। লেখক বুঝেছিলেন, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মতো এ-দেশের লোক-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যও কম নয়। তাই সেই ঐশ্বর্যকেও তিনি বিদেশীদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। বইটির প্রথম দিকে আছে তেলেনা, ত্রিবট্ট, চতুরঙ্গ, খেয়াল, ঠুংরি, গজল প্রভৃতির আলোচনা, এবং তার পরে আছে রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউল, সাঁওতালদের গান, হিন্দী চৈতি ও কাজরী গান, সাপুড়িয়া গান, এমন কি যাত্রা, কবিগান ও পাঁচালী গানের নির্দশন পর্যন্ত। প্রতিটি গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে

ইংরেজীতে। তারপর সেই গানটি সেই ভাষাতেই লিখে তার অনুবাদ ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তার স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। একটি গ্রন্থের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের নানা ধারার বৈশিষ্ট্যকে বিদেশী জিজ্ঞাসুদের সামনে তুলে ধরার এমন পরিশ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনব ও প্রশংসনীয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে শৌরীন্দ্রমোহনের কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তাই দেখা যায় শুধু খেয়াল ঠুংরি নয়, হিন্দুস্থানী দারোয়ান, সাপুড়ে বা সাঁওতালদের গানও তাঁকে আকর্ষণ করেছে, এবং এ-সব গানের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মিশেথাকা রাগ-রাগিণীর বৈশিষ্ট্যগুলিকেও তিনি আবিষ্কার করেছেন। এখানে শুধু বাউল গানটি উদ্ধৃত করা হল। জীবনরসসিক্ত ভাষা ও সরল প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে অশিক্ষিত বাউল সাধকরা তাঁদের গানে জীবন ও জগত-সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন। এই গানটি সেই ধরনের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। বাউল গান সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি পৃথকভাবে কোনো চেষ্টা করেন নি বটে তবু এই একটি গান থেকেই বোঝা যাচ্ছে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন অথবা রবীন্দ্রনাথের বহু আগে তিনিই এই কাজে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন।—

সত্য বল্ সুপথে চল্ আমার মন
তলাতল পাতল খুঁজে পাবি রে
শ্রী (ভোলা মন পাবি রে শ্রী) বৃন্দাবন
(মন কথা শোন্।)

মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনায় যেতে পারবে না
পথে আছে রে থানা
আর পড়লে ধরা যাবি মারা রে
ও রে হারাবি (ও ভোলা মন হারাবি)অমূল্য ধন।
(মন কথা শোন্।)

ফড়ে যারা মরবে তারা
বাট্‌কারাতে কম তাদের তসিল করবে যম,

আর গদিয়ান মহাজন যারা রে
তারা বসে কিন্‌বে (ভোলা মন বসে কিন্‌বে)
প্রেম রতন।
(মন কথা শোন্)।
(পৃ. ৬৯)।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শৌরীন্দ্রমোহনের দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে — 'Eight Tunes' এবং 'Indian Music's Address to Lord Litton'.

প্রথম বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কয়েকটি মাত্র রাগের এবং শেষে একটি ঢপ্ কীর্তনের পাশ্চাত্য রীতিতে স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বইটি লেখকের রাজভক্তির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখক কতকগুলি সংস্কৃত প্রশস্তি রচনা করেছেন, সেগুলির ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন আর প্রতিটি প্রশস্তিকে রাগ-রাগিণীতে বেঁধে সেগুলির স্বরলিপি দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে একটি ছবিতে রাজভক্তির ক্লাইমেক্স প্রকাশ পেয়েছে। ছবিটিতে আছেন সাত স্বরের সাতজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা— অগ্নি,ব্রহ্মা,সরস্বতী, মহাদেব, বিষ্ণু, গণেশ এবং সূর্য। একটা প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এঁরা দাঁড়িয়ে। বাড়িটি বড়লাট-ভবন হতে পারে। লর্ড লিটনের কাছে যেন ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মলোকের উপহার নিয়ে হাজির হয়েছেন। ইংরেজ শাসকদের প্রতি শৌরীন্দ্রমোহনের এই অতিমাত্রিক অনুরাগ আমাদের যে কিছুটা মর্মাহিত করে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ থেকে সঙ্গীতকলাবিদ্ হিসাবে শৌরীন্দ্রমোহন নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন, অথচ ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও যান নি। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর বার্লিন শহরে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্‌দের পঞ্চম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে শৌরীন্দ্রমোহন আমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি যান নি। না গিয়ে সঙ্গীতবিষয়ক একটি বই লিখে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। বইটির নাম — 'The Five Principal Msicians of the Hindus'(1881) বা 'ভারতীয়পঞ্চমুখ্য সঙ্গীতকারোপহারঃ'। এটি প্রায় সম্পূর্ণ

সংস্কৃতভাষাতেই রচিত, শুধু ভূমিকা ও প্রস্তাবনাটি ইংরেজীতে লেখা। বইটিতে কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। নারদ, ভরত, রম্ভা, হুহু এবং তম্বুরু — 'India's Guardian Divinity'-র আদেশে সোজা বার্লিনে উপস্থিত হয়ে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্‌দের কাছে ভারতীয় গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেন। গ্রন্থের শেষে একটি 'জার্মানী স্তোত্রম্' আছে যেটির শেষ চারটি স্তবককে সঙ্গীতে রূপ দেওয়া হয়েছে, আর শুরুতে আছে পাতাজোড়া একটি ছবি। তাতে দেখানো হয়েছে উক্ত পাঁচজন সঙ্গীতকার তাঁদের সঙ্গীতের উপহার নিয়ে বার্লিনে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্‌দের কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছেন।

১৮৮২-তে 'Hindu Music'এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাড়া শৌরীন্দ্রমোহনের আর কোনো ইংরেজী বই প্রকাশিত হয় নি। ১৮৮৪- তে প্রকাশিত হয় 'Musical Scales of the Hindus'. হিন্দু -সঙ্গীতের ঔড়ব, ষাড়ব এবং সম্পূর্ণ এই তিন প্রকার 'জাতি'-তে ত্রিশটি রাগ-রাগিণীর পরিচয় পাশ্চাত্য রীতির স্বরলিপির মাধ্যমে বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে 'Remarks on the applicability of Harmony to Hindu Music.'

হিন্দু-সঙ্গীতে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের 'Twenty-two Musical Sruties' বইটি প্রকাশিত হয়। এটিও একটি পকেট-বুক ধরনের বই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যেই লেখক 'শ্রুতি' সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন। 'শ্রুতি' কি জিনিস? — "সপ্তকস্থিত স্বরসমূহের ক্রমোচ্চতা-পরিমাপক একক বা unit-বিশেষের 'শ্রুতি' নামকরণ সম্পর্কে বলা হয় যে, স্বরের এই ক্রমোচ্চতা একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনুভূত হয়, অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না, এ-জন্যই ইঁহার নাম শ্রুতি হইয়াছে।" ('ভারতীয় সঙ্গীতকোষ')। একটি স্বর-সপ্তকের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সূক্ষ্ম স্বরগুলির সংখ্যা ২২-টি বলে ধরা হয়। অনেক সঙ্গীত-বিশারদের মতে এই শ্রুতিগুলির অবস্থান সমান

সঙ্গীত সমালোচনী

আশ্বিন সন ১২৭৯ সাল | ১ সংখ্যা

... music in himself
... with concord of sweet sounds
... stratagems and spoils,
... spirit are dull as night,
... dark as Erebus
... man be trusted.

Shakespeare

— —

[illegible]

একটি সুখ আছে। সেই সুখ আহাদের হৃদয়ে রসনা দ্বারা অনুভূত হয়। মনুষ্য সুখটি বাছিয়া লইতে পারিবে এই আশয়ে করুণাময় পরমেশ্বর উভয়েই রসন-সুখের সুখ প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত সুখ যাহা [illegible]

[illegible]

'সঙ্গীত সমালোচনী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা।

নয়। কিন্তু বর্তমান সাঙ্গীতিক গবেষণায় এ-মত সর্বাংশে স্বীকৃতি পায় নি এবং শ্রুতিগুলির সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্বর-সপ্তকের এই বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ণীত হয়। একটি তার ধ্বনিত হলে প্রতি সেকেণ্ডে কতবার তাতে কম্পন জাগে সেই সংখ্যা পাশ্চাত্য স্বর-সপ্তকের একটি প্রধান বস্তু। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রকাররা ধ্বনির এই কম্পন বিচার করে শ্রুতির সংখ্যা নির্ধারণ করেন নি, করেছেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম ক্ষমতার বিচারে। এই গ্রন্থে শৌরীন্দ্রমোহন দেখাতে চেষ্টা করেছেন ভারতীয় শাস্ত্রকাররা শ্রুতির সংখ্যা ২২-টি নির্ধারিণ করেছেন কেন। মনে রাখতে হবে এটি বিশেষ করে বিদেশীদের জ্ঞানের জন্যেই লেখা।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুখানি গ্রন্থই রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি – তাঁর জুবিলি -উৎসব উপলক্ষে রচিত। এ-দুখানি বই লেখার পিছনেও লেখকের সেই রাজভক্তি ক্রিয়াশীল যার পরিচয় আমরা আগে পেয়েছি। একটির নাম – 'Six Ragas and Thirty-Six Raginies' এবং অপরটির নাম 'Victoria Samrajyam'. প্রথম বইটির নাম দেখে মনে হতে পারে এটা বুঝি রাগ-রাগিণীর বিষয়ে আলোচনা-গ্রন্থ। তা নয়। এটি হল রাণী ভিক্টোরিয়ার গুণস্তুতি। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরে বাঁধা। অবশ্য এই সঙ্গে রাগ-রাগিণীগুলির পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে লেখায় ও রেখায়। ছবিগুলি সেই সময়ের কোনো শিল্পীর আঁকা। বিশেষ উপভোগ্য নয়। দ্বিতীয় বইটি হল ইতিহাস – সঙ্গীতের মাধ্যমে রাণীর রাজত্বের ইতিহাস। দুটি গ্রন্থই কিন্তু ইংরেজী অনুবাদ-সহ সংস্কৃতে লেখা। এমন বই লেখার প্ররণা লেখক যে কোথা থেকে পেয়েছিলেন বলা মুশকিল।

এরপর বেশ কয়েক বছর শৌরীন্দ্রমোহনের আর কোনো ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। ন'বছর পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সে বইটি বোরোয়, আমি মনে করি, সেটি তাঁর সঙ্গীত-সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান। বইটির মাম 'Universal History of Music'. এতে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখক ভূমিকায় লিখেছেন –

"The following pages furnish an account of the music of various nations, civilized or uncivilized on the face of the habitable globe."

আলোচ্য বিষয়ের এই বিশাল পরিধির জন্যে স্বভাবতই অনেক বিষয়ের অনুপুঙ্খ আলোচনা লেখক স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু জগতের সভ্য-অসভ্য বহু জাতির সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যের একটি সুন্দর সাধারণ পরিচয় এতে পাওয়া যাবে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও বৃটিশযুগে সঙ্গীতের অবস্থা এবং উনিশ শতক পর্যন্ত তার বিবর্তন নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। স্থান-বিশেষ বা অঞ্চল-বিশেষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সঙ্গীতে যে বৈচিত্র্যের রূপটি ফুটে উঠেছে লেখক তাঁর আলোচনায় সে-দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। এ-ছাড়া পরিশিষ্টে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে পৃথক আলোচনাও আছে। ভারতবর্ষের বাইরে এশিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের একটি সাধারণ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। শিল্পের মাধ্যমেই একটি জাতির হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটে, তাকে চেনা যায়। আর বিভিন্ন শিল্পরূপের মধ্যে কাব্য ও সঙ্গীতই হল হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাই কোনো জাতির অন্তরের খবর জানতে হলে তার কাব্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এই পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে লেখকের যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে তা আমাদের বিস্মিত করে। বিভিন্ন সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ, অভিধান, গেজোটিয়ার, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া এমন কি ইতিহাস-ভূগোলের বিভিন্ন বইও তাঁকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পড়তে হয়েছে। তাই মনে হয় শৌরীন্দ্রমোহনের 'Universal History of Music' মানব-মনের মণিকোঠায় পৌঁছানোর সার্থক প্রচেষ্টা।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Victoria Mahatmyam' নামে শৌরীন্দ্রমোহনের আর একটি ভিক্টোরিয়া-বন্দনা প্রকাশিত হয়। এটিও আগের মতো ইংরেজী অনুবাদ ও স্বরলিপিসহ সংস্কৃতে লেখা।

ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত উজ্জ্বল পরিচয় শৌরীন্দ্রমোহন

সেদিন বিদগ্ধ ইংরেজদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সে-কাজে তিনি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিলেন। শুধু ইংরেজ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশও তাঁর এই সার্থকতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। সঙ্গীতকলাবিদ্ হিসাবে বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি তখন সে-সব সম্মান অর্জন করেছিলেন তার দীর্ঘ তালিকা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। মুসলমানরা এ-দেশে এসে ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। কারণ এ-দেশকে তাঁরা স্বদেশ বলেই মনে করতেন। তাই এ-দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের পরিচিত হয়ে উঠতে বাধে নি। কিন্তু য়ুরোপীয়রা তা পারেন নি। মুসলমান ও হিন্দুর মিলিত সাধনায় এ-দেশে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে, অনেক নতুন রাগ-রাগিণীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয়রা এ-সব কিছুই করতে পারেন নি, পারা তাঁদের দ্বারা সম্ভবও ছিল না। তবু এমন বেশ কয়েকজন বিদেশীকে আমরা পেয়েছি যাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে এ-দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় নতুন করে উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যেই আবার কয়েকজন ভারতীয় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের জগতেও প্রবেশ করেছেন অসাধারণ নিষ্ঠা নিয়ে। তাই শৌরীন্দ্রমোহনের জন্মের অনেক আগেই তাঁরা কেউ কেউ হিন্দু-সঙ্গীত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কেউ বা প্রবন্ধ লিখেছেন এদেশীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম্ জোন্স্ 'মিউজিক্যাল মোডস্ অব্ দি হিন্দুস্' নামে একটি বই লেখেন। তাঁর আগে এ-বিষয়ে আর কেউ কোনো আলোচনা করেন নি। তারপর উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ক্যাপটেন্ এন্. আগষ্টাস্ উইলার্ড ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অনেক আলোচনা করেন। ফৌজের লোক হলেও আসলে ইনি ছিলেন সঙ্গীত-জগতেরই বাসিন্দা। ঠাট, তান, আলাপ রাগ-রাগিণীর পরিচয় এ-সব নিয়ে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তারপর স্যার উইলিয়াম অস্‌বি, উইলিয়াম সি. স্টাফোর্ড, লেঃ কর্নেল জেমস্ উড্, ডাঃ এ. ক্যাম্বেল প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিদেশী, কেউ গ্রন্থ লিখে আবার কেউ প্রবন্ধ লিখে এ-দেশের শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা

করেছেন। এঁদের অনেকের লেখা শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর'HIndu Music'- Part I (1875) গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর অসাধারণ একক প্রচেষ্টায় এবং দীর্ঘ সৃষ্টিশীল সাধনায় এ-দেশের শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নয়, সমগ্র সঙ্গীত-জগতের স্বর্ণদ্বার পৃথিবীর আগ্রহী মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সে-যুগে এ-কৃতিত্ব আর কেউ নয়, একমাত্র তিনিই অর্জন করতে পেরেছিলেন।

নাটক, নাট্যধর্মী রচনা ও নাট্যতত্ত্বের আলোচনা – বাংলা ও ইংরেজী।

বাংলা নাট্য -সাহিত্য ও অভিনয়-শিল্পের মানোন্নয়নের জন্যে কলকাতার ঠাকুর-পরিবারের উভয় ধারাতেই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বেলগাছিয়া, পাথুরিয়াঘাটা এবং জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চগুলি বাংলা নাটকাভিনয়কে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল অল্পকাল পরেই যার স্বাভাবিক শুভপরিণতি দেখা গেল সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় (১৮৭২)। নাটক রচনার সেই আদি যুগে রামনারায়ণ তর্করত্ন খুবই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় তাঁর 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের সময় (১৮৫৮) এ-দেশে প্রথম ঐকতান সঙ্গীত শোনা গেল। শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই বাদন-রীতির প্রবর্তক এবং তিনিই এর স্বরলিপিরও উদ্ভাবক। এ-কথা আগে বলা হয়েছে। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের কয়েকখানি নাটক অভিনীত হয়। শৌরীন্দ্রমোহনের অগ্রজ যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের মতো রামনারায়ণকেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

বাংলা নাটক রচনার এই নতুন উদ্দীপনা কিশোর বয়েসেই শৌরীন্দ্রমোহনের মনে দোলা দিয়েছিল। লিখেছিলেন 'মুক্তাবলী' নাটিকা। তখন তার বয়েস পনেরো বছর। অবশ্য এটি প্রকাশিত হয় কয়েক বছর পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। (২য় সংস্করণ ১৮৭৬) । কৈশোরের লেখা। স্বাভাবিকভাবেই লেখায় অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। লেখকের অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় কিছু-কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন

করেছিলেন। সে যাই হোক, ২য় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' ঘোষনা করেছে – " এই ক্ষুদ্র মুক্তাবলী নাটিকাখানি সঙ্গীত-বিশারদ মিউজিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রথম রচনা।" অর্থাৎ এটি তাঁর প্রথম নাটক রচনা। আসলে তাঁর প্রথম লেখা আরো এক বছর আগে আমরা পেয়েছি 'ভূগোল ও ইতিহাস-ঘটিত বৃত্তান্ত' যার কথা আগে বলা হয়েছে।

এই বছরেই (১৮৫৯) শৌরীন্দ্রমোহনের একটি অনুবাদ-নাটক প্রকাশিত হয় – 'মালবিকাগ্নিমিত্র'। এতেও অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে এবং অনুবাদও ভালো হয় নি।

পরিণত বয়েসে তিনি আর কোনো নাটক রচনা বা অনুবাদে হাত দেন নি। তবে বিভিন্ন রসের কাজ ও প্রভাব দেখানোর জন্যে নাটকের আকারে লেখা 'রসাবিষ্কার বৃন্দক' গ্রন্থটি (১৮৮০) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শৃঙ্গার, রৌদ্র, করুণ, বীর, বীভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত ও হাস্য – এই আটটি রসের 'কার্যমূর্তি' এতে দেখানো হয়েছে। শুরুতেই নারদ ও শচীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বৃন্দকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অমরাবতীতে ইন্দ্রের সভার দৃশ্য। দেবরাজ নতুন নাট্যাভিনয় দেখার বাসনা প্রকাশ করলেন। শচীও মত দিলেন। তখন নারদ বললেন –

"দেবী কি বৃন্দকাভিনয় দর্শন করেছেন?

শচী। বৃন্দক আবার কি?

নারদ। যে নাট্যে বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে নানা জাতির কার্য এককালে প্রদর্শিত হয় এবং যার অঙ্ক সংখ্যার নিয়ম নাই তাকেই বৃন্দক বলে। আমার বিবেচনায় অদ্য রাসাবিষ্কার বৃন্দক প্রদর্শিত হলে ইন্দ্রানীরও মনোরঞ্জন হতে পারবে এবং দেবরাজেরও প্রীতি লাভ হবে।"

এইভাবে সামান্য কথোপকথনের পর নাটক শুরু হল। প্রত্যেক রসের কার্যমূর্তি দেখানোর আগে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে সেই রসাশ্রিত একটি করে গান আছে। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থ শৌরীন্দ্রমোহন প্রথম লেখেন ইংরেজীতে — 'The Eight Principal Rasas of the Hindus with Murti and Vrindaka or Tableaux and dramatic pieces illustrating their

character'.(1879). বইটি কিছুটা আলোচনা-গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন রস, ভাব, অনুভাব ও বিভাবাদি, নাটকের গঠন-রীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় আলোচনায় এর নাট্যরূপ একেবারে চাপা পড়ে গেছে।

পরের বছর বাংলায় 'রাসাবিষ্কার বৃন্দক'-এর সঙ্গে ইংরেজীতে তাঁর এই ধরনের আর একটি বই প্রকাশিত হয় — 'The Ten Principal Avataras of the Hindus' (1880). এই বইটিরও প্রথমে কয়েকটি প্রবন্ধে মঞ্চের আয়তন, মঞ্চসজ্জা, আলোক, নাটকের মূল রস অনুযায়ী যবনিকার রঙ্ প্রভৃতি মঞ্চ-সংক্রান্ত কয়েকটি আলোচনা এবং অবতারগণের সাধারণ পরিচিতি আছে। তারপর আছে প্রত্যেক অবতারের সম্পর্কে একটি করে স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্র ও সেগুলির ইংরেজী অনুবাদ। প্রতিটি স্তোত্রই বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরে বাঁধা। সঙ্গে আছে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সেগুলির স্বরলিপি।

নাট্যতত্ত্বসংক্রান্ত মননশীল আলোচনায় সমৃদ্ধ শৌরীন্দ্রমোহনের দুটি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য 'The Hindu Drama' (১ম খণ্ড ১৮৮০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৮) ও 'The Dramatic Sentiments of the Aryas' (১৮৮১)। প্রাচীন নাট্যতত্ত্বের আলোচনার দিক থেকে প্রথম বইটির দুটি খণ্ডই অত্যন্ত মূল্যবান। দুটি খণ্ডেই সেকালের নাট্যশাস্ত্রের বহু প্রসিদ্ধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। লেখক তাঁর মতের সমর্থনে অনেক উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডটি উৎসর্গ করা হয়েছে লর্ড্ ডাফ্‌রিন্‌কে। এ-ছাড়া শৌরীন্দ্রমোহন ১৮৮০-তে সংস্কৃত 'বেণী-সংহার' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। শৌরীন্দ্রমোহন কবি, নাট্যকার বা গীতিকার হিসাবে সার্থক হতে পারেন নি। প্রকৃত সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন না। অবশ্য নিজের এই অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে তাঁর দেরি হয় নি। তাই দেখি পরিণত বয়েসে কোনো কবিতার বই বা নাটক লেখার চেষ্টাও তিনি বিশেষ করেন নি।

আলোচনা-মূলক গভীর মননধর্মী গ্রন্থগুলিই তাঁর যথার্থ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। এ-ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর প্রচেষ্টার নজির রেখে গেছেন।

অন্যান্য গ্রন্থ —

বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ে লেখা শৌরীন্দ্রমোহনের দশখানি গ্রন্থ আমাদের রীতিমতো আশ্চর্য করে। সেকালের একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধকের গুণী শিষ্য, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে যথার্থ পণ্ডিত ও নিবিষ্টমনা সঙ্গীতকলাবিদ্ যখন ভারতীয় অশ্বকুলের স্বাভাব-চরিত্র নিয়ে অথবা হিন্দুদের কৌলিন্যপ্রথা নিয়ে অথবা বিজ্ঞানের বা আয়ুর্বেদের বিষয় নিয়ে বই লেখেন তখন অবশ্যই আশ্চর্য হবার কারণ ঘটে। এই বইগুলির সব ক'টির বা সর্বাংশের রচিয়তা শৌরীন্দ্রমোহন কিনা কেউ-কেউ এ-প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখা যে নয় এমন তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া অন্য বিষয়েও যে তাঁর আকর্ষণ ছিল কৈশোরে লেখা তাঁর প্রথম বইটি তো তার প্রমাণ। এ-আকর্ষণ পরবর্তীকালেও নানা রকম বিষয়ে প্রকাশ পেয়ে থাকলে তাকে অসম্ভব বলে ধরে নেওয়া অযৌক্তিক। আমার মনে হয় এ বইগুলি তাঁরই রচনা, তবে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। বিশেষভাবে সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহনের পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরা এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বলে এখানে তাঁর এই ধরনের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

1. Manimala - 1879

জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদে শৌরীন্দ্রমোহনের যে জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তিনখানি গ্রন্থে। 'মণিমালা' সেই ধরনের প্রথম বই। এতে নানা রকম মণিমাণিক্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

2. Roma- Kavya - 1880

শৌরীন্দ্রমোহনকে মাঝে-মাঝে কতকগুলি উদ্ভট খেয়াল চেপে ধরত।

এ-বইটি সেই খেয়ালের চাপে লেখা। ইংরেজী অনুবাদসহ সংস্কৃত কবিতায় রোম সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

3. **Roma-Poema - 1882.**

এটিও আগের মতোই বই। ইংরেজী অনুবাদসহ ল্যাটিন ভাষায় লেখা রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

4. **Hindu Loyalty - 1883**

এ-দেশের প্রজারা কোনো কালেই রাজাকে অবজ্ঞা করে নি। রাজার প্রতি আনুগত্য এ-দেশবাসীর চিরাচরিত স্বভাবধর্ম। লেখক এই ব্যাপারটা শাস্ত্রীয় সমর্থনে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, আর সেই সঙ্গে নিজেরও নির্জলা রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

5. **The Caste System of the Hindus - 1884**

বইটিতে লেখকের পৌরাণিক ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় আছে। হিন্দুদের মধ্যে কায়স্থ, তিলি, নাপিত, বারুরি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কি ভাবে উদ্ভব হয় এ-সম্পর্কে আলোচনা -প্রসঙ্গে লেখক একটি তালিকা দিয়েছেন। কৌলীন্য প্রথার ওপরেও একটি সুন্দর আলোচনা আছে।

6. **The Orders of Knighthood - 1884**

'নাইট্' উপাধি পাওয়ার পর লেখা।

7. **A Brief History of Bakarganj - 1892**

ইতিহাসের প্রতি শৌরীন্দ্রমোহনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল — তা সঙ্গীতের ইতিহাসই হোক বা বিশেষ কোনো স্থানের ইতিহাসই হোক। বইটি বাংলার একটি অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তথ্যের দিক থেকে কতটা নির্ভরযোগ্য তা ঐতিহাসিকরা বিচার করবেন।

8. **Abhra - 1899**

এটি 'মণিমালা' এবং পরে প্রকাশিত'ধাতুমালা' ধরনের বই। এই বইটি ও পরের বই 'ধাতুমালা' দুখানি বই-ই শৌরীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন 'জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার' তদানীন্তন ডাইরেক্টর G. L. Griesbach-এর বিশেষ অনুরোধে। অভ্রের ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনার বই।

সঙ্গীতসারঃ।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থের নামপত্র।

9. Our Indian Horses - 1899

এই গ্রন্থটিই শৌরীন্দ্রমোহনের লেখা সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন সঙ্গীতকলাবিদ্, যিনি এই পরিচয়ে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে অসাধারণ সমাদর লাভ করেছিলেন হঠাৎ ভারতীয় অশ্বকুলের সম্পর্কে তাঁর এই আগ্রহ দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। কিন্তু বইটি তাঁকে কেন লিখতে হয় সে-সম্পর্কে ভূমিকায় তিনি লিখেছেন –

"At the desire of His Honor the Lieutenent Governor of Bengal [Sir John Woodburn], Veterinary Captain F. Raymond, F.R.C.V.S. etc., Superintendant, Civil Veterinary Deptt., Bengal, addressed me a letter ... requesting me to submit my opinion as to the cause of the deterioration in the quality of country -bred horses and ponies in Bengal, and my suggestions for the improvement of the breed."

ছোটলাট সাহেবের আগ্রহ ও রেমণ্ড সাহেবের অনুরোধই হল বইটি লেখার মূল কারণ। কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁর তো কোনো জ্ঞান ছিল না। থাকার কথাও নয়। তিনি তাঁর জমিদারির নানা পদস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন। কেউই সদুত্তর দিতে পারলেন না। তখন লেখক পড়াশোনা শুরু করলেন এবং বিভিন্ন বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বইটি লিখলেন। এতে শুধু তাঁর নিজের মত নয় –

"Along with my reply which embodied my personal views on the subject, I forwarded a few notes on the animal, compiled and translated from the ancient medical and other works of the Hindus" (preface).

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র অনুযায়ী ঘোড়ার বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ , ভালো বা খারাপ ঘোড়ার বিচার, ঘোড়ার অঙ্গপুষ্টি ও তার নানা রোগমুক্তির উপায় ইত্যাদি বিভিন্ন অশ্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে এতে সুন্দর আলোচনা আছে।

10. Dhatumala - 1903

এই বইটিও 'জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার' ডাইরেক্টর G. L. Griesbach-এর অনুরোধে লেখা বিভিন্ন ধাতুর গুণাগুণ সংক্রান্ত বই।

গ্রন্থকার হিসাবে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কিশোর বয়েসের রচনা 'ভূগোল ও ইতিহাস-ঘটিত বৃত্তান্ত' গ্রন্থে। এবং শেষ পরিচয় তাঁর প্রবীণ বয়েসের লেখা'ধাতুমালা'-তে। অতএব দেখা যাচ্ছে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও মনীষার যা যথার্থ রূপ তার সঙ্গে দুটি প্রান্তই অসম্পৃক্ত। অবশ্য সঙ্গীত বা নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বইগুলির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে তিনি যে-সব বই লিখেছেন সেগুলির প্রকাশকালের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারি একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। যে-বছর তিনি লিখেছেন 'সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা' সেই বছরেই বেরিয়েছে তাঁর 'The Caste System of the Hindus' (1884)। ১৮৭৯-তে তিনি লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী সঙ্গীতগ্রন্থ — 'A Few Specimens of Indian Songs' এবং ঐ বছরেই বেরিয়েছে তাঁর 'Manimala' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে নানা রকম জ্ঞানচর্চা তিনি যুগপৎ চালিয়ে গেছেন। তবু আমরা তাঁকে সেকালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ্ এবং সঙ্গীতের মহান্ পৃষ্ঠপোষক বলেই মনে রাখব। কারণ এই পরিচয়ই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

প্রকাশকাল অনুযায়ী শৌরীন্দ্রমোহনের গ্রন্থাবলী

(পড়ার সুবিধার জন্যে বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রেও ক্রমিক-সংখ্যা ও সাল ইংরেজীতে দেওয়া হল।)

1. ভূগোল ও ইতিহাস-ঘটিত বৃত্তান্ত - 1857.
   (কৈশোরের লেখা। তিন বছর পরে প্রকাশিত)
2. মুক্তাবলী নাটিকা - 1859, 2nd-ed. 1876,
   (এটিও কৈশোরের লেখা। পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত)
3. মালবিকাগ্নিমিত্র - 1859
4. জাতীয় সঙ্গীত-বিষয়ক প্রস্তাব - 1870
5. যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা - 1872.
6. মদৃঙ্গ-মঞ্জরী - 1873, 2nd. ed.1902.
7. হারমোনিয়াম সূত্র - 1874
8. যন্ত্রকোষ - 1875
9. সঙ্গীতসার সংগ্রহ - 1875.
10. Hindu Music, Part I - 1875
11. English Verses Set to Hindu Music - 1875.
12. Victoria Gitika - 1875.
13. ভিক্টোরিয়া গীতিমালা - 1877.
14. Six Principal Ragas - 1877.
15. Fifty Tunes - 1878.
16. A Vedic Hymn - 1878.
17. গীতাবলী (হিন্দী) - 1878
18. A Few Specimens of Indian Songs. - 1879
19. The Eight Principal Rasas of the Hindus - 1879.

20. Manimala - 1879.
21. Eight Tunes - 1880
22. Indian Music's Address to Lord Litton - 1880
23. The Ten Principal Avataras of the Hindus - 1880.
24. Roma Kavya - 1880.
25. Hindu Drama, Part I - 1880
26. রসাবিষ্কার বৃন্দক - 1880.
27. বেণীসংহার নাটকের ইংরেজী অনুবাদ - 1880
28. The Five Principal Musicians of the Hindus বা ভারতীয়পঞ্চমুখ্যসঙ্গীতকারোপহারঃ-1881
29. The Dramatic Sentiments of the Aryas - 1881
30. Hindu Music, 2nd. ed. - 1882.
31. Roma Poema - 1882.
32. গীত-প্রবেশ - 1883
33. Hindu Loyalty -1883
34. সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা - 1884
35. The Musical Scales of the Hindus - 1884
36. The Caste System of the Hindus - 1884.
37. The Orders of Knighthood - 1884
38. Twenty-two Musical Srutis - 1886
39. Six Ragas and Thirty -six Raginis - 1887
40. Victoria Samrajyam - 1887
41 A brief History of Bakharganj - 1892
42. Universal History of Music - 1896.
43. Victoria Mahatmyam - 1897.
44. Abhra - 1899.
45. Our Indian Horses - 1899
46. Dhatumala - 1903.

গ্রন্থপঞ্জী

১। বসু নগেন্দ্রনাথ - বঙ্গের জাতীয় ইতহসা।

২। কুমার জ্ঞানেন্দ্রনাথ - বংশ পরিচয়।

৩। বসু অঞ্জলি - বাঙালী চরিতাভিধান, ১ম সং,১৯৭৬।

৪। শাস্ত্রী শিবনাথ - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,২য় সং, ১৯০৯।

৫। সেন ডঃ সুকুমার - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং ১৩৭৭।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ - সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড।

৭। গোস্বামী ক্ষেত্রমোহন - সঙ্গীতসারঃ, ১ম সং ১২৭৫।

৮। প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী - রাগ ও রূপ, ১ম ভাগ, ১৩৫৫।

৯। প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী - সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ১৩৫৯।

১০। বন্দ্যোপাধ্যায় গোপেশ্বর -সঙ্গীত-চন্দ্রিকা, রবীন্দ্রভারতী সং. ১৩৭৪।

১১। রায়চৌধুরী বীরেন্দ্রকিশোর ও দাস প্রফুল্লকুমার - হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস, ২য় সং ১৯৬৫।

১২। সেন দীপঙ্কর - য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী, ১ম সং ১৯৭০।

১৩। সেন ক্ষিতিমোহন - বেদোত্তর সঙ্গীত, ১ম সং ১৯৮৪।

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ - সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্বভারতী, ১ম সং ১৩৯২।

১৫। রায়চৌধুরী বিমলাকান্ত - ভারতীয় সঙ্গীতকোষ, ২য় প্রকাশ ১৩৯১।

১৬। গঙ্গোপাধ্যায় অর্ধেন্দুকুমার - ভারতশিল্প ও আমার কথা, ১৯৮১।

১৭। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার - ভারতের সঙ্গীত গুণী, ১ম সং ১৯৭৭।

১৮। মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ - গীত-রত্নমালা, ১ম সং ১৩০৩।

১৯। চক্রবর্তী সোমনাথ - কলকাতার বাঈজী-বিলাস, ১ম সং ১৯৯১।
২০। Furrell J. W. -The Tagore Family - a Memoir, 2nd. ed. 1892.
২১। Ghose Lokenath - The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc.
২২। Ganguly O. C. - Ragas and Ragnis, 1948.
২৩। Ganguly O. C. - Non-Aryan Contribution to Aryan Music, Poona, 1934.
২৪। Fyzee-Rahamin Atiya Begum - The Music of India, London, 1925.
২৫। Greiringer Karl - Musical Instruments, London, 1945.
২৬। Hansard's Parliamentary Debate, Vol. 242, PT.I.

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন সম্মান ও উপাধি –

কোনো দিন ভারতবর্ষের বাইরে না গিয়েও শৌরীন্দ্রমোহন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর সম্মান ও উপাধি লাভ করেছিলেন। আমরা বিস্মিত হই তার তালিকার দিকে তাকালে। এখানে সেই তালিকা থেকে কয়েকটির উল্লেখ করা হল। —

India - Companion of the Order of the Indian Empire. Sanad of the title of Raja with Khilat; Certificate of Honour from the Government as Founder of the Bengal Music School; Fellow of the University of Calcutta ; Degrees of Samgita Silpa Vidyasagara and Bharatiya Samgita Nayaka from Nepal.

England - Member of the Royal Asiatic Society and Fellow of the Royal Society of Literature; Honorary Patron of the Society of Science Letters and Arts of London. Doctor of Music.

America - Degree of Doctor of Music.

France - Officer of the Academy, Paris; Honorary Member of the First Class of the Academic Montreal.

Italy - Honorary Member of the Royal Academy of St. Cecilia, Rome ; Academic Correspondent of the Royal Musical Institute, Florence; Co-operating Member of the Academia Pittagorica, Naples etc.

Switzerland - Corresponding Member of the Geneva Institute.

Austria - Corresponding Member of the Oriental Museum, Vienna etc.

Sweden - Honorary Member of the Royal Musical Academy, Stockholm.

Greece - Honorary Member of the Archaeological Society of Athens.

Australia - Honorary Member of the Philharmonic Society of Melbourne.

Holland - Corresponding Member of the Society of Amsterdam.

এ ছাড়া তুর্কী, মিশর, পারশ্য, চীন, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকেও তিনি বহু উপাধি ও সম্মান লাভ করেছিলেন। তালিকাটি ফারেল সাহেবের 'টেগোর ফ্যামিলি' গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার অংশ।